মানব সভ্যতার ধারা

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book on History for Class VI.
Vide Notification No. TB/79/VI/H/81. Dated 5. 12. 79]

মানব-সভ্যতার ধারা

(প্রাচীন যুগ)

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

অশোক প্রকাশন
৬১-৬২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

বিষয়-সূচী

SYLLABUS OF HISTORY :

CLASS-VI

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS

	Pages :	No. of Lessons :
A. (i) Why we should read history ; (to be acquainted with human civilisation, its development.)	1	1
(ii) How we come to know of ancient people	2	1
B. EARLY MAN.		
Use of fire as early as 300,000 B. C. (by 'Peking Man') : Food-gathering man.		1
Old Stone Age :		
Nature of tools and implements, their uses		1
New Stone Age : (By 8000 B. C.) Evolution of tools and implements. Man—a food-producer.		2
The Neo-lithic revolution consisted also of domestication of animals ; invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling—stone houses with defences ; early transport beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-paintings, etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess or productivity.	6	4 (for 'B' as a whole)
C. COPPER-BRONZE AGE :		
Emergence of towns ; changes in production—(specialisation various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reasons of growth of River-Valley Civilisations.	4	3
D. THE EARLY CIVILISATIONS (3000 B. C.—1500 B. C.)— Mesoptamia, Egypt, Indus Valley, China—in outlines :		
(*i*) *Mesopotamia* :		
(a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas.		
(b) Fertility of the soil,—crops.		
(c) Defence against floods.		
(d) Other occupations.		
(e) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.	5	4

	Pages :	No. of Lessons :
(ii) *Egypt* :		
(a) Location and nature of the land :		
(b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax-collectors and 'soldiers' (workers) ;		
(c) Trade ;		
(d) The Pyramids (example) ;		
(e) Religious beliefs ;		
(f) Chief occupations.	7	6
(iii) *The Indus Valley* :		
(a) The discoveries (brief reference to locations and findings) ;		
(b) Town planning ;		
(c) Food and other articles of use ;		
(d) Carfts ;		
(e) Trade ;		
(f) Worship ;		
(g) Light thrown by relics upon classification in society.	7	5
(iv) *China* :		
(a) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang ;		
(b) China in early times ;		
(c) Myths (particularly of flood).	2	1
(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.	3	2
E. THE IRON AGE SOCIETY :		
(a) Discovery and use of iron, its impact ;		
(b) Main features of social and economic life ;		
(c) Growth of Kingship.	2	2
I. (i) *Babylon* : Farming and Commerce ; Temples and Priests ; Learning and culture ; The Code of Hamurabi—nature of society revealed by the Code.		3
(ii) *Egypt as an Imperial power* : Colonies ; The power of priests.		2
(iii) *Iran* : Rise of Persia ; Zoroaster.		2
(iv) *The Jews* : Hebrews in Egypt. Hebrew exodus under Moses—flight from slavery.	12 (for E as a whole)	2

	Pages : No. of Lessons	
II GREECE (only in broad outlines) : An introductory note on the influence of Crete : The Homeric Age. The city state, cultural interchange, colonisation. Athens and Sparta—their social and political life Athens Vs Sparta. Cultural greatness of Athens ; Literature, Arts, Religion - brief reference to a few eminent persons e g., Pericles, Sophocles, Socrates, Herodotus. Macedon : Alexander—his invasion of India. Fall of the Empire. Roman conquest of Greece	10	9
III ROME : Origin of Rome. Conflict with Carthage Early Roman Society : Particians and Plebeians ; Roman citizenship, Slavery and slave revolt (Spartacus). Julius Caesar : End of Roman Republic New Empire Eventual decline and fall. Rise of Christianity.	8	7
IV. CHINA : "Great Shang." Confucius—his teachings Building the Great wall. The Chin Empire	3	2
V. INDIA : (a) The coming of the Aryans. (b) The Vedas. (c) Early Aryan Society, religion and political organisation (with reference to the Vedas). (d) The Epics (e) The rise of Jainism and Buddhism. (f) The Empires—a brief outline of developments from the Mauryas - to the Kushans—to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal up to the decline of the Guptas (on the basis of proven historical materials viz. inscriptions and literary evidence). (h) Foreign contacts (particularly with Central Asia)—their impact upon society and trade). (i) Foreign Travellers—Megasthenes and Fa Hien—general picture of society as revealed in their accounts (in breif outlines only). (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature, education (Taxila and Nalanda) and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).	14	10

প্রথম পরিচ্ছেদ

১. ইতিহাস পড়ি কেন

ইতিহাস কাকে বলে : এমন একদিন ছিল, যখন মানুষ গাছে ও পাহাড়ের গুহায় বাস করত ; শীত-গ্রীষ্ম ঝড়-বৃষ্টিতে কষ্ট পেত ; গাছের ফলমূল কুড়িয়ে, বনের পশুপাখি মেরে ও নদী-হ্রদ-জলাভূমির মাছ ধরে খেত ; উলঙ্গ থাকত বা গাছের পাতা, বাকল ও পশুর চামড়া দিয়ে শীত নিবারণ করত ; পদে পদে হিংস্র শ্বাপদ ও সরীসৃপের সম্মুখীন হ'ত। এক কথায়, ছিল অসভ্য।

এখন আমরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে নিরাপদ গৃহে বাস করি ; সুস্বাদু বিচিত্র খাদ্য-পানীয় আহার করি ; সুদৃশ্য আরামপ্রদ পোশাক পরি ; পথঘাট, অট্টালিকা-প্রাসাদ-মন্দির বানাই ; আলোকে আলোকে গৃহ, নগর, জনপদ সাজাই ; অনায়াসে স্বল্প সময়ে দূর-দূরান্তরে চলে যাই ; মহাসমুদ্রে পাড়ি দিই, মহাকাশে উড়ি, চাঁদে যাই, গ্রহ-গ্রহান্তরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। এক কথায়, সভ্য হয়েছি।

কিন্তু মানুষ একদিনেই তো এই অবস্থায় পেঁৗছে নি। লাখ লাখ বছর ধরে অবিরাম অনলস চেষ্টার ফলে একটু একটু ক'রেই সে এগিয়েছে। এই এগোবার ধারাবাহিক কাহিনীই হ'ল **ইতিহাস**।

ইতিহাস পড়ে লাভ কি : মনে হ'তে পারে, অতীতের এইসব কাহিনী প'ড়ে লাভ কি? লাভ এই যে, এই কাহিনী প'ড়ে আমরা বুঝতে পারি, মানুষ কতো বর্বর অবস্থা থেকে আজকের সভ্যতার এই স্তরে এসে পেঁৗছেছে। বুঝতে পারি, মানুষের সমাজ-সভ্যতা ক্রমাগতই এক স্তর থেকে উন্নততর আর এক স্তরে উন্নীত হচ্ছে। জানতে পারি সমাজ-সভ্যতার কথা।

আর এইসব কথা জানতে পারলে আমরাও সমাজ-সভ্যতাকে উন্নততর স্তরে পেঁৗছে দেওয়ার জন্যে সচেষ্ট হ'তে পারি। ইতিহাস পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা এতেই।

২. প্রাচীনকালের মানুষের কথা কেমন ক'রে জানতে পারি

এখন থেকে কয়েক লাখ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষ প্রথম জন্মেছিল। সেই সুপ্রাচীন কালের মানুষ তো লিখতে-পড়তে জানত না যে, তাদের লেখা প'ড়ে তাদের কথা জানতে পারব। তবু তাদের কথা জানার জন্যে একালের মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই।

কালক্রমে তো সবই লোপ পায়। লাখ-লাখ বছর আগের মানুষের চিহ্ন কীই বা থাকতে পারে? কিন্তু সব চিহ্নই যে একেবারে লোপ পেয়ে যায়, তাও নয়। লাখ-লাখ বছর আগেকার প্রাণীদের হাড় অনেক সময় নষ্ট না হয়ে মাটির তলায় চাপে প'ড়ে পাথর হয়ে যায়। তাকে বলে **জীবাশ্ম** বা **ফসিল**। এইসব জীবাশ্ম বা ফসিল সুপ্রাচীন কালের মানুষ সম্পর্কে জানার কাজে অনেক সাহায্য করেছে।

ধরো, একটি গুহায় মাটির নিচে একই স্তরে একটি মানুষের হাড়ের ফসিল ও পাথরের তৈরি অস্ত্র পাওয়া গেল। তা থেকে বোঝা সহজ যে, ঐ মানুষ ঐ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত। এ-ও বোঝা গেল, পাহাড়ের গুহায় সে বাস করত। পণ্ডিতরা মাটির স্তরের গভীরতা ইত্যাদি বিচার ক'রে বুঝতে পারেন, কতোকাল আগে ঐ মানুষটি ঐ গুহায় বাস করেছিল।

তাই সুপ্রাচীনকালের মানুষদের কথা জানার জন্যে পৃথিবীর চারদিকেই অনেক দিন ধরে অনেক খোঁজ ও খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। খোঁজ ও খোঁড়াখুঁড়ির ফলে পৃথিবীর নানা জায়গায় মানুষের ও জীবজন্তুর অনেক দেহাবশেষ এবং ঐসব মানুষের ব্যবহৃত পাথরের হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে তাদের ব্যবহৃত আরো অনেক জিনিস।

ধরো, একটা গুহার মুখে দু-তিন লাখ বছর আগেকার **ম্যামথ** বা বিশাল লোমশ হাতির হাড়ের ফসিল আর গুহার মধ্যে মানুষের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্র ও বাসের চিহ্ন পাওয়া গেল। এ থেকে আমরা কি বুঝতে পারি?

একলা কেউ তো ঐ বিরাট জানোয়ারটাকে মারতে পারে না? নিশ্চয় অনেক লোক মিলে অনেক কৌশল ক'রে ওটাকে মেরেছিল। বুঝতে পারা গেল, মানুষ তখন নিশ্চয় দল বেঁধে থাকত, দল বেঁধে শিকার করত, আর পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত।

এমনি সব সন্ধান, অনুমান ও বিচারের ভিত্তিতেই চলেছে সুপ্রাচীন মানুষের কথা জানার কাজ। আবিষ্কৃত হয়েছে সুপ্রাচীন মানুষের কতো বাসস্থান, কতো কবরখানা। বাসস্থানগুলির চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা গেছে তাদের জীবনযাত্রার অনেক কথা। মানুষ জীবিত অবস্থায় যেসব জিনিস ব্যবহার করত, সেগুলি তার কবরেও দেওয়া হ'ত। সেগুলি থেকেও জানা গেছে তাদের জীবনযাত্রার অনেক কথা।

সন্ধান ও খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে কতো পল্লী ও নগরের **ধ্বংসাবশেষ**—কতো বাড়ি, পথঘাট, প্রাসাদ, মন্দির, ভুক্তাবশেষ, মনোরম সুদৃশ্য পাত্র, মূর্তি, বিস্ময়কর সব চিত্র, অলংকার, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র। এসব জিনিস থেকে প্রাচীন মানুষের সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে।

এখন থেকে পাঁচ-ছ হাজার বছর আগেকার মানুষ সম্বন্ধে জানা আরো সহজ

হয়ে গেছে। ঐ সময়ে মানুষ লেখার জন্যে লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার করেছিল। তারা ঐসব অক্ষরে অনেক হিসাব-নিকাশ, অনেক বিবরণ লিখেছিল। সেগুলি এখন আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐসব লিপি এখনকার কোনো লিপি বা অক্ষরের মতো ছিল না। কিন্তু পণ্ডিতরা অসাধ্য সাধন ক'রে ঐসব অনেক লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন। ফলে মিশর, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সুপ্রাচীন মানুষ ও তাদের সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কথাই জানা গেছে।

কেবল কি তাই? সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে ঐ যুগের কতো সীলমোহর, অনুশাসন, সুন্দর সুন্দর পাত্র, পাত্রের গায়ে আঁকা অপূর্ব সব ছবি, কতো মন্দির, দেবদেবীর ও রাজারাজড়ার কতো মূর্তি!

এখন থেকে তিন-চার হাজার বছর আগেকার মানুষ ও তাদের সমাজ-সভ্যতার কথা জানা তো আরো সহজ। কারণ, ঐ সময়কার মানুষ নিজেরাই রচনা ক'রে গেছেন কতো **ধর্মশাস্ত্র**, কতো **মহাকাব্য**, এমনকি **ইতিহাস** পর্যন্ত। সেগুলিতে তাঁদের জীবনযাত্রা ও সমাজ-সভ্যতার কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস কাকে বলে?

২। ইতিহাস প'ড়ে লাভ কি?

৩। কয়েক লাখ বছর আগেকার মানুষের কথা আমরা কিভাবে জানতে পারি?

৪। সুপ্রাচীন কালের মানুষদের কথা জানতে জীবাশ্ম কিভাবে সাহাযা করে? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

৫। মাটির তলা থেকে সুপ্রাচীন মানুষদের কি কি নিদর্শন আমরা সাধারণত পেয়েছি?

৬। প্রাচীন লিপি বলতে কি বোঝ? এইসব লিপি প্রাচীন মানুষদের কথা জানতে আমাদের কিভাবে সাহায্য করেছে?

৭। এখন থেকে দু-তিন হাজার বছর আগেকার প্রাচীন মানুষের কথা জানা কিছুটা সহজ কেন?

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

১। জীবাশ্ম বা ফসিল কি?

২। লিপি কি?

৩। ম্যামথ কি?

১. আদিম মানুষ

চিরকাল পৃথিবীতে প্রাণী ছিল না। এখন থেকে প্রায় এক শ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। শ্যাওলার মতো এককোষী জীব থেকে ক্রমবিকাশের ফলে একদা পৃথিবীতে উদ্ভিদ, মাছ, পোকামাকড়, সরীসৃপ, পাখি ও পশুর জন্ম হ'ল।

লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেল। স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভব হ'ল বানর জাতীয় প্রাণীর। তারপরও কত লাখ বছর যে কেটে গেল কে জানে? এখন থেকে মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভব হ'ল গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মতো প্রাণীর—আর সবশেষে মানুষের।

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভে গভীর মৃত্তিকা-স্তরে আদিম মানুষের বহু মাথার খুলি ও হাড়ের ফসিল পাওয়া গেছে। এইসব মাথার খুলি ও হাড়গুলির টুকরো জোড়া লাগিয়ে পণ্ডিতরা বুঝেছেন, এইসব **আদিম মানুষ** আমাদের মতো মানুষ এবং গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মাঝামাঝি কয়েকটি স্তরে ছিল। যেসব জায়গায় ঐ সব আদিম মানুষের মাথার খুলি, হাড় প্রভৃতি পাওয়া গেছে, সেইসব জায়গার নাম অনুসারে পণ্ডিতরা ওদের নানারকম নাম দিয়েছেন। নাম যাই হ'ক, এটা ঠিক, এরা কেউই খাঁটি মানুষ ছিল না।
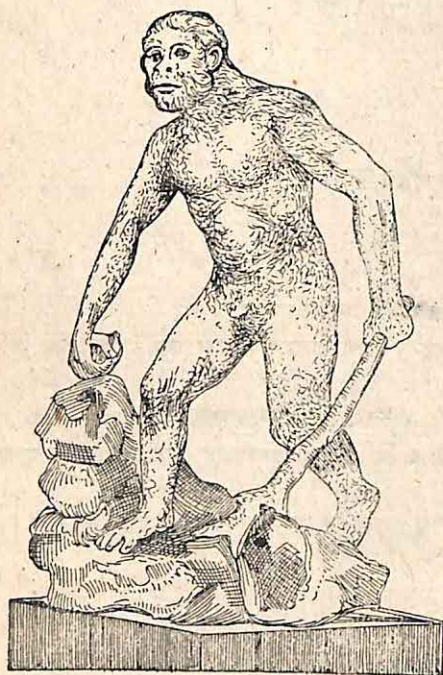
আদিম মানুষের একটি কাল্পত চিত্র

এইসব আদিম মানুষের কপাল ছিল ঢালু, চোখের ওপরে ভুরুর অংশ ছিল সোজা ও আলের মতো উঁচু, চোয়াল বেশ বড়ো, ঘাড় প্রায় ছিল না, মস্তিষ্কের কোটর ছিল ছোট, আর হাঁটুর কাছের হাড় বাঁকা।

এদের চোয়াল খুব বড় হওয়ায় এরা সম্ভবত আমাদের মতো কথা বলতে পারত না। এদের হাঁটুর কাছে পায়ের হাড় বাঁকা থাকায় এরা সম্ভবত সামনের দিকে ঝুঁকে পা টেনে চলত। এদের মস্তিষ্ক বেশ ছোট হওয়ায় এদের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি নিশ্চয় আমাদের চেয়ে কম ছিল।

চীনদেশের পিকিং শহরের কাছে একটি পাহাড়ের গুহায় তিন লাখ বছর আগেকার আদিম মানুষের কিছু ফসিল পাওয়া গেছে। ঐসব ফসিলের সঙ্গে যেসব জন্তু-জানোয়ারের হাড় পাওয়া গেছে, সেগুলিতে আগুনে পোড়ার চিহ্ন আছে। তা থেকে বোঝা যায়, এরা আগুনের ব্যবহার জানত। সম্ভবত বজ্রপাত, দাবাগ্নি, কাঠে-কাঠে বা পাথরে-পাথরে ঘষার ফলে আগুন জ্বলা থেকে এরা আগুনের ব্যবহার শিখেছিল।

এইসব আদিম মানুষ থেকে ক্রমবিকাশের ফলেই শেষে আমাদের মতো মানুষের—অর্থাৎ প্রকৃত মানুষের—জন্ম হয়েছিল।

২. পুরা-প্রস্তর যুগ—ঐ যুগের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি—সেগুলির ব্যবহার

প্রস্তর যুগ ঃ মাটির তলায় মানুষের মাথার খুলি ও হাড়ের সঙ্গে অনেক পাথরের টুকরোও পাওয়া গেছে। ঐ টুকরোগুলি স্বাভাবিক পাথরের টুকরো নয়; ঐগুলিকে আদিম মানুষ পাথর ভেঙে হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র রূপে ব্যবহারের জন্যে তৈরি করেছিল। তারা গাছের ডাল, হাড়, শিং প্রভৃতিও নিশ্চয় হাতিয়ার ও অস্ত্র রূপে ব্যবহার করত। কিন্তু সেগুলি কালক্রমে লোপ পেয়েছে।

আদিম মানুষের পরে যখন প্রকৃত মানুষের উদ্ভব হয়েছিল, তখন গোড়ার দিকের প্রকৃত মানুষরাও পাথরের হাতিয়ার ও অস্ত্র ব্যবহার করত। কি আদিম মানুষ, কি গোড়ার যুগের প্রকৃত মানুষ, কারো ফসিলের সঙ্গে কোথাও ধাতুনির্মিত কোনো হাতিয়ার বা অস্ত্র পাওয়া যায়নি। তা থেকে বোঝা যায়, এরা কেউই ধাতুর ব্যবহার জানত না। তাই এই যুগকে নাম দেওয়া হয়েছে **প্রস্তর-যুগ**।

পুরা-প্রস্তর যুগ ঃ প্রস্তর যুগের যে সময়কার পাথরের হাতিয়ার ও অস্ত্রগুলি বেশ বড়, এবড়ো-খেবড়ো, ভোঁতা ও ছিদ্রহীন ছিল, সেই সময়টাকে পণ্ডিতরা নাম দিয়েছেন **পুরা-প্রস্তর যুগ**। পুরা-প্রস্তর যুগ কিছু-কম তিন লাখ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই সুদীর্ঘকালেও হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয়নি। পাথরের এইসব হাতিয়ার ও অস্ত্র দেখে বোঝা যায়, এগুলি খুঁড়বার জন্যে খোন্তা,

জোরে ঘা দিয়ে কাটার জন্যে কোনো অস্ত্র বা চেঁছে-ছুলে আঁচড়ে পরিষ্কার করার
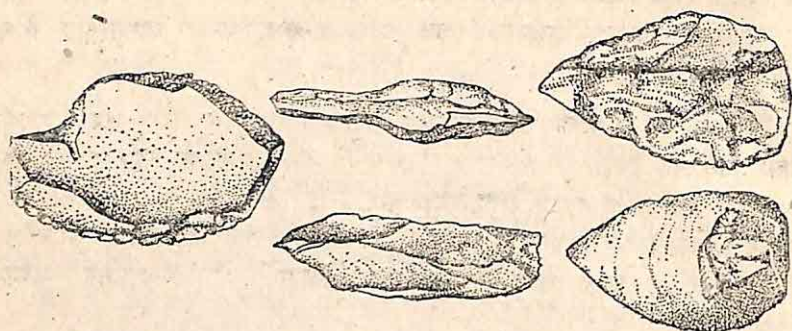
পুরা-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র

জন্যে কোনো হাতিয়ার রূপেই ব্যবহৃত হ'ত। এগুলি দিয়ে তারা মাটি খুঁড়ত, জোরে ঘা দিয়ে মাংস কাটত, আঁচড়ে চেঁছে-ছুলে চামড়া পরিষ্কার করত।

পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক: পুরা-প্রস্তর যুগের এইসব মানুষের ফসিল, হাতিয়ার ও অস্ত্র দেখে বেশ বোঝা যায়, এরা গাছের ফলমূল, জন্তু-জানোয়ার ও পাখির মাংস এবং মাছ খেত। এরা খাদ্যের জন্যে বনের ফলমূল সংগ্রহ করত, বনে বনে শিকার ক'রে বেড়াত। চাষ-আবাদ ও পশুপালন জানত না। এরা খাদ্য উৎপাদন করত না, কেবল সংগ্রহই করত। তাই পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষদের বলা হয়েছে **খাদ্য-সংগ্রাহক**।

এরা আগুনের ব্যবহার জানায় সম্ভবত মাছ-মাংস ঝলসে খেত। আগুনের তাপে শীত নিবারণ করত; অন্ধকার গুহাগুলি আগুনের আলোয় আলোকিত করত; আগুন জ্বালিয়ে রেখে হিংস্র জানোয়ারদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করত।

৩. নবপ্রস্তর যুগ

পুরা-প্রস্তর যুগের শেষদিকে প্রকৃত মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। এদের কপাল ছিল খাড়া; এদের চোখের উপরের হাড় সোজা ও আলের মতো উঁচু ছিল না; মস্তিষ্কের কোটর ছিল বড়; চোয়াল আদিম মানুষের তুলনায় ছোট; হাঁটুর কাছের পায়ের হাড় সোজা, আর চিবুক স্পষ্ট। এদের মস্তিষ্ক বড় হওয়ায় এদের যথেষ্ট বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি ছিল; চোয়াল ছোট হওয়ায় এরা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারত; পায়ের হাড় সোজা হওয়ায় খাড়া হয়ে হাঁটতে পারত।

এদের উদ্ভাবনী শক্তি কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই পুরা-প্রস্তর যুগের অবসান ঘটিয়েছিল। পুরা প্রস্তর যুগের অবসান হয়েছিল এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। শুরু হয়েছিল আর এক নূতন যুগ।

এই নূতন যুগে মানুষ পাথরের হাতিয়ার ও অস্ত্রগুলিকে ছোট, মসৃণ ও সুতীক্ষ্ণ ক'রে তুলল। পাথর ছিদ্র ক'রে তাতে হাতল পরাল। আগে যা খোন্তা ছিল, এখন তা হয়ে উঠল কুড়ুল, নিড়ানির যন্ত্র। তারা পাথরকে কেবল ধারালোই করল না, তাতে দাঁতের মতো খাঁজ কেটে কাস্তের মতো হাতিয়ার বানাল। ছিদ্র করতে
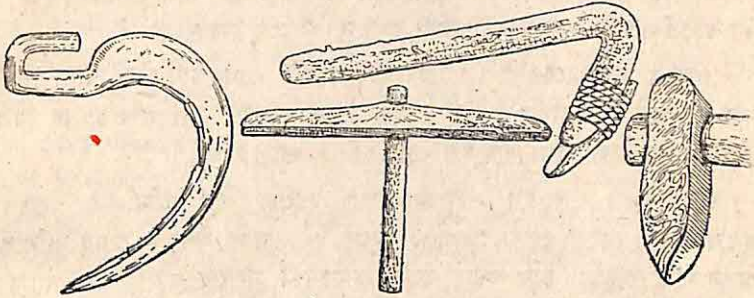
নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র

শেখায় তারা হাড় দিয়ে সূচের মতো জিনিস বানাল। এখন তারা চামড়া ও বাকল সেলাই ক'রে পোশাক বানাল। কেবল কি তাই? অন্যান্য দিকেও এদের উদ্ভাবনী শক্তি যুগান্তর আনল। এরাও কিন্তু ধাতুর হাতিয়ার ও অস্ত্র বানাতে পারত না। তাই এরাও ছিল প্রস্তর যুগেরই মানুষ। পণ্ডিতরা এই যুগটার নাম দিয়েছেন **নব-প্রস্তর যুগ**।

এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে নবপ্রস্তর যুগ শুরু হয়েছিল। পুরাপ্রস্তর যুগের তুলনায় নব-প্রস্তর যুগ স্থায়ী হয়েছিল অল্পদিন।

৪. মানুষ এখন খাদ্য-উৎপাদক

পুরাপ্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত। তারা প্রকৃতির দেওয়া শস্য ও ফলমূল এবং মাছ-মাংস দিয়ে ক্ষুধা মেটাত। তাদের মেয়েরা শস্য ও ফলমূল সংগ্রহ করত, আর পুরুষরা করত শিকার। সব সময় শিকার মিলত না। শস্য ও ফলমূলও সব সময় যথেষ্ট পরিমাণে মিলত না। তাই এদের খাদ্য ছিল খুব অনিয়মিত ও অনিশ্চিত।

কৃষিকার্য ঃ মেয়েরাই বনে-বাদাড়ে শস্য ও ফলমূল সংগ্রহ করত। কারণ, শিকারের তুলনায় এ কাজ ছিল হালকা। মেয়েরা এখন তাদের বহুকালের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিল বীজ থেকে, কন্দ থেকে, ডাল থেকে কিভাবে গাছগুলি নূতন ক'রে জন্মায়। তাই তারা তাদের কাজের ফাঁকে বাসস্থানের কাছে কিছু কিছু শস্যের বীজ বুনল, গাছ-পালা লাগাল। এইভাবে শুরু হ'ল চাষ। তারা দেখল, বনে-বাদাড়ে দিনান্ত শস্য ও ফলমূল সংগ্রহ করার চেয়ে এ কাজ অনেক সহজ।

ক্রমেই চাষ-আবাদ বাড়তে লাগল। এখন মানুষ হয়ে উঠল **কৃষিজীবী**। তারা কৃষিকার্যের উপযোগী ক'রে মাটি খোঁড়ার জন্যে উন্নত ধরনের খোন্তা বা নিড়ানি বানাল, ফসল কাটার জন্যে বানাল কাস্তে, শস্য গুঁড়ো করবার জন্যে বানাল পাথরের খল ও নোড়া।

গোড়ার যুগে তারা গম ও যবের চাষ করল। পরে ধান, জোয়ার, ভুট্টা প্রভৃতিও চাষ করতে লাগল। চাষ করল নানা কন্দ, সবজি ও ফলের গাছও।

গোড়ার দিকে চাষের কাজ স্ত্রীলোকরাই করত। তখন চাষ হ'ত খোন্তা ও নিড়ানি দিয়ে। পরে যখন লাঙল ও গরু চাষের কাজে ব্যবহৃত হ'ল আর চাষের কাজ বেশ শ্রমসাধ্য হয়ে উঠল, তখন পুরুষরাই চাষ-আবাদ করতে লাগল।

পশুপালন ঃ শিকারে জন্তু-জানোয়ার পাওয়া খুব অনিশ্চিত ছিল। তাই মানুষ শিকার ফেলে ভেড়া, ছাগল, শূকর ও গবাদি পশুকে পোষ মানিয়ে পশু-পালন শুরু করল। চাষ করার ফলে কৃষিজীবী সমাজে গৃহপালিত পশুর খাবার যোগানো সহজ ছিল। জলাভূমি অঞ্চলে বা তৃণাঞ্চলে পশু-খাদ্য প্রচুর পাওয়া যেত। তাই ঐসব অঞ্চলের লোকেও প্রধানত পশুপালনের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। পশুপালনের ফলে মাংসের যোগান সহজ ও নিশ্চিত হ'ল। ক্রমে দুধের ব্যবহারও মানুষ শিখল।

এইভাবে মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহক থেকে হয়ে উঠল **খাদ্য-উৎপাদক**।

৫. মৃৎশিল্প, বয়ন, গৃহনির্মাণ ও পরিবহণ

মৃৎশিল্প ঃ বছরে একবার ফসল ফলে। তাই কৃষিজাত শস্যকে সারা বছরের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখতে হয়। সম্ভবত গোড়ার দিকে ঝুড়ি-চুপড়ি বানিয়ে তাতেই শস্য সঞ্চয় করা হ'ত। পরে ঐসব ঝুড়ি-চুপড়ির গায়ে কাদার লেপ দিয়ে সেগুলিকে শস্য রাখার জন্যে ছিদ্রহীন করা হ'ত। পরে ঐসব কাদা-লেপা ঝুড়ি বা চুপড়িগুলিকে স্থায়ী করার জন্যেই সম্ভবত আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া শুরু হয়। আগুনে পোড়াতে গিয়ে দেখা যায়, ভেতরের ঝুড়ি বা চুপড়ি পুড়ে গেছে, আর মাটির আস্তরণটা আগুনে পুড়ে কঠিন পাত্রে পরিণত হয়েছে। এ ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এখন থেকে মাটির পাত্র বানানো শুরু হল। মাটির পাত্র বানাতে গিয়ে মানুষ নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করল। তারা বুঝতে পারল কিভাবে মাটিকে পাত্র তৈরির উপযোগী করতে হয়, কোন্ মাটিতে ভালো পাত্র তৈরি হ'তে পারে, কি পরিমাণ তাপে মাটির পাত্র ফেটে যায় না আর বেশ শক্ত হয়, কিভাবে পুড়লে পাত্রের রঙকে ইচ্ছামতো লাল বা কালো করা যায়, ইত্যাদি।

গোড়ার দিকে মানুষ কেবল হাতের সাহায্যেই মৃৎপাত্রগুলি তৈরি করত। এতে সময় ও শ্রম লাগত বেশী ; অনেক সময় সেগুলির গড়নও ত্রুটিহীন হ'ত না।

কিন্তু মানুষ যেদিন মৃৎপাত্র তৈরিতে চাকের ব্যবহার শুরু করল, তখন এল যুগান্তর। এখন সে অতি অল্প সময়েই মৃৎপাত্রগুলি তৈরি করতে পারল, মৃৎপাত্রগুলির গড়নও হয়ে উঠল সুন্দর ও সুষম। এখন মানুষ মৃৎপাত্রগুলিকে ইচ্ছামতো আকার দিতে পারল। অনেকে মনে করেন, মৃৎপাত্র তৈরিও মেয়েরাই প্রথমে আবিষ্কার করেছিল।

বয়নঃ নবপ্রস্তর যুগে বয়নশিল্পেরও সূচনা হয়েছিল। পুরা-প্রস্তর যুগে মানুষ পাতা, বাকল ও পশুর চামড়া দিয়ে শীত ও লজ্জার আবরণ তৈরি করত। নবপ্রস্তর যুগে সূচ আবিষ্কার হওয়ায় চামড়া সেলাই ক'রেও পোশাক তৈরি হ'তে থাকে। কিন্তু এখন চাষ ও পশুপালন শুরু হওয়ায় শণ ও তিসি জাতীয় গাছের আঁশ, তুলো ও পশুর লোম থেকে সুতো তৈরি ক'রে কাপড় বোনা শুরু হ'ল। সে যুগে সুতো কাটা ও কাপড় বোনার যন্ত্র কি রকম ছিল ঠিক জানা যায় না। কেননা সেগুলি নিশ্চয় কাঠ দিয়েই তৈরি হ'ত এবং সেজন্যেই সেগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ পেয়েছে। নবপ্রস্তর যুগে যে কাপড় ও পোশাকের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অনেকের মতে, বয়নশিল্পও মেয়েদেরই আবিষ্কার।

বাসগৃহঃ পুরাপ্রস্তর যুগে মানুষ প্রধানত পাহাড়ের গুহাতে বাস করত। কিন্তু পাহাড়ের কাছের মাটি সাধারণত উর্বর হয়। তাই পাহাড় থেকে দূরে চাষ-আবাদের জন্যে উর্বর মাটির সন্ধান করতে হয়। চাষের খেতগুলিকে দেখা-শোনা করা এবং পাহারা দেওয়ার জন্যে কৃষিক্ষেত্রের কাছে থাকা দরকার। তাই নবপ্রস্তর যুগে চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গুহায় বাস করার যুগ শেষ হ'ল। মানুষ কৃষিক্ষেত্রের কাছেই তাদের ঘরবাড়ি বানাতে লাগল। নলখাগড়া জাতীয় গাছ ও কাদা দিয়েই তারা প্রধানত তাদের ঘরগুলি তৈরি করত। যেখানে পাওয়া যেত, সেখানে তারা পাথর দিয়েও বাড়ি বানাতো। এই সময়ে কুড়ুলের মতো ধারালো অস্ত্র থাকায় তারা গাছ কেটে কাঠ দিয়েও বাড়ি করত। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা ঘরগলির চারদিকে কাঠ-পাথর ও খুঁটি দিয়ে রক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলত। অনেকে হ্রদ বা জলাশয়ের মধ্যে বড় বড় কাঠ পুঁতে বাড়ি বানাত। ঐরকম অনেক বাড়ির চিহ্নও পাওয়া গেছে।

পরিবহণঃ নবপ্রস্তর যুগে পরিবহণ-ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছিল। আগে মানুষ নিজেই মাল বইত। পশুপালন করায় এখন গৃহপালিত পশুকে সে মাল বওয়ার কাজে লাগাল। তখনও সম্ভবত ঘোড়াকে মানুষ পোষ মানাতে পারেনি। গাধাই ছিল প্রধান বাহন। লোকে গাধার পিঠে চড়ত, গাধাকে দিয়ে মাল বওয়াত। গাড়ির মতো যানও ব্যবহৃত হ'ত। তবে গোড়ার দিকে সেগুলি ছিল স্লেজের মতো চাকাহীন—সেগুলিকে সমতল জমির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত। লোকে তখন চাকার ব্যবহার জানত না। কিন্তু শীঘ্রই তারা

চাকার ব্যবহার শুরু করল। এইভাবে গাধায় টানা গাড়ি নবপ্রস্তর যুগেই চালু হয়েছিল।

নবপ্রস্তর যুগে কুড়ুল ও খোন্তার মতো ধারালো অস্ত্র থাকায় ঐ যুগে ডোঙার মতো জলযানও চালু হয়েছিল। নলখাগড়া জাতীয় গাছের আঁটি বেঁধে বা কাঠের পাশে কাঠ বেঁধে লোকে ভেলাও বানাতো।

৬. স্থায়ী সমাজ-জীবনের সূচনা—ভাষার উদ্ভব

নবপ্রস্তর যুগে চাষ-আবাদ শুরু হওয়ায় মানুষ এখন খাদ্যের সন্ধানে দূর-দূরান্তে দিনরাত ঘুরে বেড়াত না। এখন সে যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করেছিল। এইভাবে কৃষিক্ষেত্রগুলির কাছে গড়ে উঠেছিল পল্লী। মানুষ এখন এক-একটি জায়গায় স্থায়ী অধিবাসী হয়েছিল। স্থায়িভাবে একজায়গায় বাস করায় গড়ে উঠেছিল **সমাজ** ও **সমাজ-জীবন**।

একই স্থানে দলবদ্ধভাবে দীর্ঘকাল বাস করায় এবং একযোগে কাজ করায় এখন নিজেদের মধ্যে মনের ভাব ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল। মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে পরস্পরকে জানাবার জন্যে সকল কিছুরই ক্ষেত্রে দরকার হয়েছিল একটা না একটা সুনির্দিষ্ট নাম বা শব্দের। এইসব নির্দিষ্ট নাম বা শব্দ দীর্ঘকাল ব্যবহার করায় সেগুলি স্থায়ী ও সর্বসম্মত রূপ পেল। এভাবেই সৃষ্টি হ'ল **ভাষার**।

৭. বিশ্বাস ও সংস্কার—উৎপাদিকা-শক্তির দেবী—শিল্পকলা

বিশ্বাস ও সংস্কার : সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনে নানারকম বিশ্বাস ও সংস্কার গড়ে উঠেছিল। মরণেই জীবনের শেষ হয় না, মানুষ একেবারে মারা যায় না, এমন একটা ধারণা তাদের মনে ছিল। জীবনের সঙ্গে উষ্ণতার এবং মৃত্যুর সঙ্গে হিমশীতলতার একটা সম্পর্ক তারা লক্ষ্য করেছিল। তাই গোড়ার যুগে দেখা যায়, তারা মৃতদেহগুলিকে তাদের বাসস্থানের মধ্যে যেখানে আগুন বা চুল্লি জ্বালানো হ'ত তার কাছেই কবর দিত। আশা, আগুনের তাপ পেতে পেতে হয়তো একদিন মৃতদেহগুলিতে আবার জীবন ফিরে আসবে। মরার পরে মানুষের সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না, এমন বিশ্বাসও তাদের ছিল। তাই তারা মৃতদেহের সঙ্গে কবরে মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় সকল জিনিসই দিয়ে দিত।

উৎপাদিকা-শক্তির উপাসনা : মানুষ এখন উৎপাদক হয়েছিল। তারা দেখত, মেয়েদের গর্ভ থেকেই সন্তানের জন্ম হয়। কৃষি, পাত্র নির্মাণ, বয়ন প্রভৃতি সকল কাজ গোড়ার দিকে মেয়েরাই করত। তাই লোকে মেয়েদের উৎপাদিকা-শক্তির প্রতীক মনে করত। উৎপাদিকা-শক্তিকে তারা দেবীরূপেও কল্পনা করেছিল।

অনেক সময় তারা স্ত্রীলোককে উৎপাদিকা-শক্তির প্রতীকরূপে পূজো ক'রে তাকে বলি দিত, আর মনে করত, ঐ স্ত্রীলোকের রক্তে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাবে।
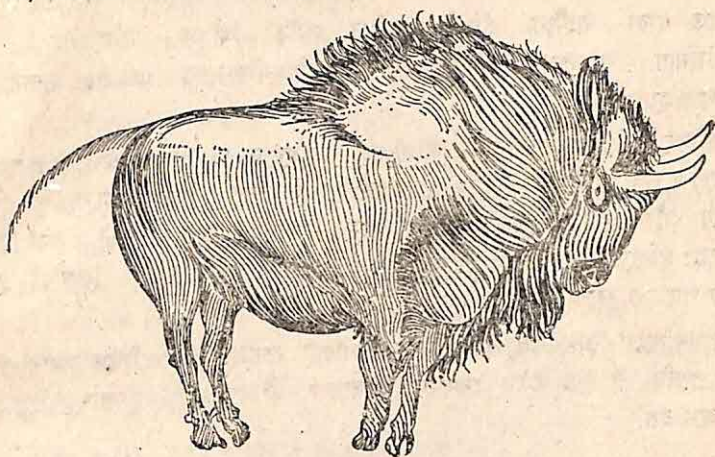
প্রস্তর যুগে স্পেনে পাহাড়ের গায়ে আঁকা বাইসনের ছবি

শিল্পকলা ঃ তারা মৃৎশিল্পে পটু হওয়ায় ক্রমে মূর্তিনির্মাণ করতেও শুরু করেছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকে তারা চিত্রাঙ্কনেও দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তারা
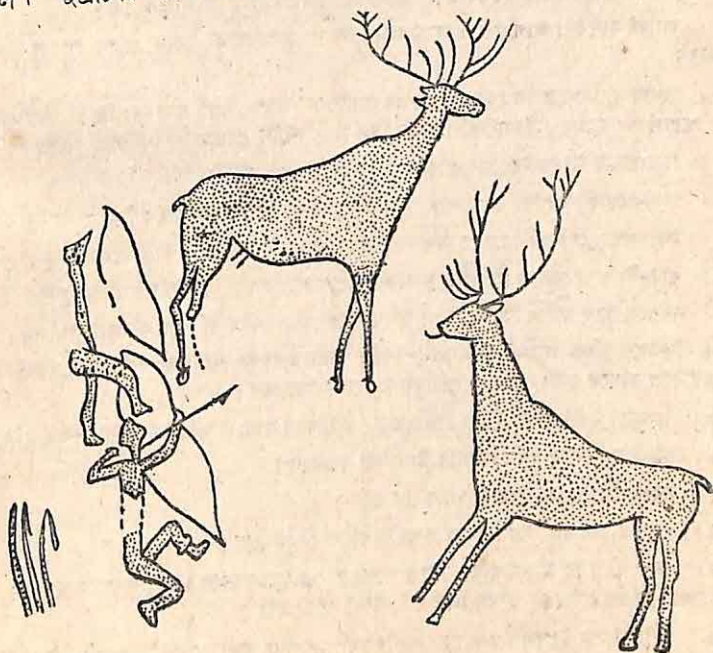
স্পেনের পাহাড়ের গুহায় আঁকা হরিণ-শিকারের ছবি

পাহাড়ের গুহায় ও পাহাড়ের গায়ে অনেক সুন্দর-সুন্দর ছবি এঁকেছিল। স্পেন দেশের গিরিগুহায় ঐ রকম অনেক সুপ্রাচীন ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। ছবিগুলিতে তারা বাইসন, হরিণ প্রভৃতির মূর্তি আঁকত। দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনে আল্‌টামিরা গিরিগুহায় তাদের আঁকা হরিণ-শিকারের একটি সুন্দর ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ছবিগুলি শিল্পকার্যের জন্যে আঁকা হত মনে হয় না। কেননা, এগুলি লোকচক্ষুর আড়ালে দুর্গম পাহাড়ের গুহায় আঁকা হয়েছিল। নিশ্চয় জাদুবিদ্যা বা তুক রূপেই এগুলি আঁকা হ'ত। শিকার ছিল অনিশ্চিত। শিকারীদের মনে এই ধারণা ছিল যে, শিকারের ছবিতে যদি হরিণকে তীরবিদ্ধ করা হয়, তবে বাস্তব ক্ষেত্রেও শিকারী হরিণের সন্ধান পাবে ও তাকে তীরবিদ্ধ করবে।

প্রস্তর যুগে তৈরি কিছু কিছু মূর্তিও পাওয়া গেছে। সেগুলিতে মেয়েদের স্তন, উদর প্রভৃতিকেই বড় ক'রে দেখানো হয়েছে। ঐ সব মূর্তি উৎপাদনশক্তির প্রতীক ছিল মনে হয়।

অনুশীলনী

১। আদিম মানুষ বলতে কি বোঝ? এদের সঙ্গে খাঁটি মানুষের পার্থক্য কি?

২। আদিম মানুষরা আগুনের ব্যবহার জানত কি? এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া গেছে কি? কি প্রমাণ?

৩। প্রস্তর যুগ বলতে কি বোঝ? প্রস্তর যুগকে ক' ভাগে ভাগ করা হয়েছে? ভাগগুলির নাম কি? পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলি কেমন ছিল? সেগুলি প্রধানত কি কি কাজে লাগত?

৪। পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?

৫। খাদ্য-সংগ্রাহক বলতে কি বোঝ? কোন্ যুগের মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহক ছিল?

৬। নবপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র কেমন ছিল? সেগুলি কি কাজে প্রধানত ব্যবহৃত হয়?

৭। খাদ্য-উৎপাদক বলতে কি বোঝ? কোন্ যুগে মানুষ খাদ্য-উৎপাদক হয়েছিল?

৮। নবপ্রস্তর যুগে মানুষ কি কি শিল্প আয়ত্ত করেছিল? ঐগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।

৯। কিভাবে কৃষির সূচনা হয়েছিল? কৃষি কারা উদ্ভাবন করেছিল—স্ত্রী, না পুরুষ? লাঙলের ব্যবহারের ফলে কৃষিতে কারা প্রাধান্য পেয়েছিল? কেন পেয়েছিল?

১০। কিভাবে মৃৎশিল্পের সূচনা হয়েছিল? মৃৎশিল্প কারা উদ্ভাবন করেছিল—স্ত্রী, না পুরুষ?

১১। বয়নশিল্প কোন্ যুগে কিভাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল?

১২। নবপ্রস্তর যুগের পরিবহণ সম্পর্কে কি জান?

১৩। প্রস্তর যুগের মানুষের বিশ্বাস ও ধর্মীয় ধারণা কেমন ছিল?

১৪। প্রস্তর যুগে কি মানুষ ছবি আঁকতে পারত? ঐ যুগের কোন ছবি পাওয়া গেছে কি? পাওয়া গেলে কোথায় পাওয়া গেছে? ছবিগুলি কি উদ্দেশ্যে আঁকা হ'ত?

১৫। স্ত্রীলোককে উৎপাদনের শক্তির প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়েছিল কেন? উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির জন্য কি করা হ'ত?

১৬। ঠিক উত্তরগুলির নীচে দাগ দাও ঃ

(ক) আদিম মানুষরা আমাদের মতোই মানুষ ছিল।

(খ) আদিম মানুষদের কপাল ছিল ঢালু, মস্তিষ্ক ছোট, চোয়াল বড়।

(গ) আদিম মানুষরা আগুন জ্বালাতে পারত না

(ঘ) আদিম মানুষরা ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক।

(ঙ) নবপ্রস্তর যুগে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল।

(চ) নবপ্রস্তর যুগে মানুষ মৃৎশিল্প উদ্ভাবন করেছিল।

(ছ) নবপ্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য-উৎপাদক।

১৭। বাক্যাংশগুলি ঠিকমতো সাজিয়ে বাক্য রচনা কর ঃ

নবপ্রস্তর যুগের	ছিল এবড়ো-খেবড়ো, ভোঁতা ও ছিদ্রহীন।
নবপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলি	মানুষ ছিল খাদ্য-উৎপাদক।
নবপ্রস্তর যুগ শুরু হয়েছিল	মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক।
পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলি	ছিল মসৃণ, ছোট ও সছিদ্র।
পুরাপ্রস্তর যুগের	এখন থেকে দশ হাজার বছর আগে।

সংক্ষিপ্ত বা মৌলিক প্রশ্ন ঃ

১। আদিম মানুষরা ভালভাবে কথা বলতে পারত না কেন?

২। আদিম মানুষদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি আমাদের মতো প্রখর ছিল না কেন?

৩। আদিম মানুষরা পা টেনে টেনে হাঁটত কেন?

৪। আদিম মানুষদের কপাল, চোয়াল ও ভুরুর হাড় কেমন ছিল?

৫। আদিম মানুষদের চিবুক স্পষ্ট ছিল কি?

৬। প্রস্তর যুগ কয় ভাগে বিভক্ত?

৭। প্রস্তর যুগ কাকে বলে?

৮। নবপ্রস্তর যুগ কাকে বলে?

৯। এখন থেকে কত হাজার বছর আগে নবপ্রস্তর যুগ শুরু হয়েছিল?

১০। পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষরা খাদ্য-উৎপাদক ছিল, না খাদ্য-সংগ্রাহক ছিল?

১১। পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষ কি আগুনের ব্যবহার জানত?

১২। কুমোরের কাজে চাক ব্যবহৃত হওয়ায় কি সুবিধা হয়েছিল?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

মানুষ এতদিন পাথর দিয়েই হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র বানাত। কিন্তু পাথরের ব্যবহার করতে করতে তারা তামা আবিষ্কার করল। তারা দেখল, একরকম আকরিক পাথর অত্যধিক তাপে তরল হয়ে যায় এবং পরে ঠাণ্ডা হ'লে বেশ কঠিন ও মজবুত হয়। ঐ পাথর হ'ল আসলে একরকম ধাতু—**তাম্র** বা **তামা**।

পাথরকে ইচ্ছামতো রূপ দেওয়া খুব কঠিন। কিন্তু তামাকে গলিত অবস্থায় ছাঁচে ঢেলে যেমন ইচ্ছা রূপ দেওয়া যায়। তাই এখন লোকে পাথরের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের বদলে তামার হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে লাগল। তারা অভিজ্ঞতা থেকে দেখল যে, তামার সঙ্গে টিন মেশালে তা আরও মজবুত হয়। তামা ও টিনের মিশ্র ধাতুকে বলে **ব্রোঞ্জ**। মানুষ ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগল।

লোহ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। তাই এই যুগকে বলা হয় **তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ**।

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ এখন থেকে প্রায় ছ হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর **পর্যন্ত** স্থায়ী হয়েছিল। এই যুগেই **মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারতের সিন্ধু** অঞ্চল প্রভৃতি স্থান সুসভ্য হয়ে উঠেছিল।

১. উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন—ব্যবসা-বাণিজ্য—শহরের উৎপত্তি

উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঃ আগেই বলা হয়েছে, পুরুষরা শিকার ও পশুপালন করত, আর স্ত্রীলোকরা অবসর সময়ে করত কৃষি, মৃৎপাত্র তৈরি, বয়ন প্রভৃতি কাজ। কিন্তু কৃষিকার্য যখন উন্নত হ'ল, খাদ্য উদ্বৃত্ত হ'তে লাগল, তখন বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন মানুষ পুরোপুরি সময় দিতে পারল। এক শ্রেণীর লোক কৃষিকার্য করতে লাগল, এক শ্রেণীর লোক মাটির পাত্র তৈরি করতে লাগল, এক শ্রেণীর লোক কাপড় বুনতে লাগল, এক শ্রেণীর লোক কাঠের কাজ করতে লাগল, আর এক শ্রেণীর লোক হাতিয়ার ও অস্ত্র তৈরির কাজ করতে লাগল; এমনি সব। এইভাবে সমাজে মানুষ বিভিন্ন পেশায় বিভক্ত হয়ে গেল। কৃষক ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য করায় কৃষিকার্যে যেমন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ

করল, তেমনি অন্যান্য পেশার লোকেরা নিজ নিজ বৃত্তিতে পুরুষানুক্রমে কাজ করায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে উঠল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা ঃ যারা কুমোর, তারা তো কেবল মাটির পাত্রই গড়ে ; যারা তাঁতী, তারা তো কেবল কাপড় বোনে ; যারা ছুতোর, তারা তো কেবল কাঠের কাজ করে। কুমোরের তো মাটির পাত্র খেয়ে পেট ভরে না, তাকে চাষীর কাছ থেকে শস্য, সবজি, কন্দ ও ফল নিতে হয়। চাষীর সারা বছরের ফসল সঞ্চয় করার জন্যে, রাঁধবার জন্যে, খাদ্য-পানীয় ব্যবহারের জন্যে চাই মাটির পাত্র। ছুতোরের চাই পাথরের তৈরি নানা সুতীক্ষ্ম অস্ত্র ; সেগুলি তাকে যোগাড় করতে হয় যন্ত্রপাতি যে তৈরি করে, তার কাছ থেকে ; কুমোরকে তার চাকের জন্যে ছুটতে হয় ছুতোরের কাছে। এ সবই তারা পরস্পরের কাছ থেকে **বিনিময়ের** সাহায্যে সংগ্রহ করে।

কিন্তু, ধরো, চাষীর তো অনেক জিনিসের দরকার। তার চাই মাটির পাত্র, কাপড় নিড়ানির হাতল, লাঙলের কাঠ, নিড়ানির ও হালের ফলা, কাস্তে, এমনি কতো কী ! তাকে যদি গম বা যবের বস্তা কাঁধে নিয়ে দোরে দোরে ছুটতে হয়, তবে তো তার হয়রানির সীমা থাকে না। তাতে তার সময়েরও অপচয়। দরকারী জিনিস যোগাড় করতেই যদি তাকে বিভিন্ন লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হয়, তবে সে মাঠেই বা কাজ করবে কখন ?

সকল বৃত্তির মানুষেরই তো এই একই সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি ?

এই সমস্যা সমাধানের জন্যে এক শ্রেণীর লোক উৎপাদকের কাছ থেকে জিনিস নিয়ে তা দিয়ে অন্যের চাহিদা মেটাবার কাজে লাগল। এরা উৎপাদক নয়—যারা উৎপাদন করে এবং যাদের প্রয়োজন আছে তাদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। এরা **ব্যবসায়ী**। এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য গ'ড়ে উঠল। সকল জিনিস সকল স্থানে পাওয়া যায় না। তাই এই ব্যবসায়ীরা দূর দূর অঞ্চল থেকে মাল আনার ভার নিল।

শহরের উৎপত্তি ঃ কিন্তু ব্যবসায়ীদের তো কখন কার কি দরকার জেনে বাড়ি বাড়ি ঘোরা সম্ভব নয়। তার চাই একটা নির্দিষ্ট জায়গা। এই নির্দিষ্ট জায়গায় এসেই লোকে যার যা দরকার সংগ্রহ করতে লাগল। উৎপাদকরাও তাদের মাল এনে এখানে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি ক'রে গেল।

এইভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেনাবেচা চলল। লোক-সমাগম বাড়ল। কারিগররাও তাদের সুবিধার জন্যে এখানে এসে তাদের কারখানা খুলে বসল। কৃষকরা ছাড়া অন্যান্য বহু বৃত্তির মানুষ এখানে এসে স্থায়িভাবে বাস করতে লাগল।

এখানে সকল লোককেই নিজ প্রয়োজনে সমবেত হ'তে হয়। তাই এই স্থানটি সামাজিক মিলন, উপাসনা ও উৎসবের কেন্দ্র হয়ে উঠল। যখন শাসন-ব্যবস্থা

প্রবর্তিত হ'ল, তখন এই স্থানটিই শাসন-ব্যবস্থারও কেন্দ্র হয়ে উঠল। এইভাবে গ'ড়ে উঠল শহর।

২. সমাজ-জীবনে পরিবর্তন ও বিভিন্ন শ্রেণী—উপজাতিগুলির মধ্যে সংগ্রাম—রাষ্ট্রের সূচনা

সমাজ-জীবনে পরিবর্তন ও বিভিন্ন শ্রেণী: এখন মানুষ নিজেদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশী উৎপাদন করতে পেরেছিল। তাই উদ্‌বৃত্ত দেখা দিয়েছিল। যে যতোই উদ্‌বৃত্তের অধিকারী হচ্ছিল, সে ততই সম্পদের অধিকারী হচ্ছিল। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ক'রে ধনী হয়ে উঠছিল।

মানুষ ঐ সময় জাদুশক্তিতে ও দেবদেবীর করুণায় খুবই বিশ্বাসী ছিল। এক শ্রেণীর লোক নিজেদের জাদুশক্তির ও দৈবশক্তির অধিকারী ব'লে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়েছিল। ফলে সমাজে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইভাবে সমাজে পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। মানুষ দেবদেবীকে প্রসন্ন রাখার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের এক অংশ দিত। দেবদেবীর প্রাপ্য অংশের মালিক হয়েছিল পুরোহিত। ফলে তারাও যথেষ্ট ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছিল।

সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাইরের শত্রুর আক্রমণ ঘটছিল। বাইরের শত্রুদের সঙ্গে যারা লড়াই ক'রে সমাজের মানুষ ও সম্পদকে রক্ষা করছিল, সমাজে তাদের প্রতাপ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বেড়েছিল।

এইভাবে সমাজে যেমন ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি উদ্ভব হয়েছিল উৎপাদক ও অনুৎপাদক শ্রেণীর। এখন মানব-সমাজ **শ্রেণী সমাজে** পরিণত হয়েছিল।

উপজাতিগুলির মধ্যে সংঘর্ষ: গোড়ায় এক-একটি উপজাতি নিয়ে এক-একটি সমাজ গড়ে উঠেছিল। কোনো উপজাতির প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি; কোন উপজাতির বা ছিল পশুপালন। আবার সকল উপজাতির সম্পদ ও শক্তি সমান ছিল না। এখন উপজাতি-সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় উপজাতিগুলির মধ্যে রেষারেষি ও বিবাদ দেখা দিয়েছিল। এক উপজাতি অন্য উপজাতির শস্য-সম্পদ লুণ্ঠনের চেষ্টা করত। ফলে উপজাতিগুলির মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বাধত।

রাষ্ট্রের সূচনা: এইসব যুদ্ধে উপজাতিগুলির মধ্যে যারা সাহসী, বুদ্ধিমান ও বলিষ্ঠ, তারাই অগ্রণী হ'ত। সমাজের মানুষ ও সম্পদকে রক্ষার কাজে এরা নিযুক্ত থাকায় এরা যেমন মর্যাদার অধিকারী হ'ত, তেমনি প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠত। কেবল বাইরের আক্রমণ থেকে নয়, সমাজের ভেতরে যেসব অন্যায়-অবিচার ঘটত, তা থেকেও মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব এদের উপর এসে পড়ত।

সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করত এরা। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যারা প্রধান ছিল, তারাই ক্রমে সমাজের শাসক হয়ে উঠেছিল। পুরোহিতরাও অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল, তারাও অনেক সময় শাসক হয়ে উঠত। এইভাবে অনেক সমাজে **রাজা** ও **পুরোহিত-রাজার** উদ্ভব হয়েছিল। এরাই দেশের শাসন চালাত। দেশে শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ায় **রাষ্ট্রের** সূচনা হয়েছিল।

৩. নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশের কারণ

কৃষিজীবী সমাজগুলি যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে এক-একটি স্থানে কিছুদিন স্থায়ীভাবে বাস করলেও তারা একই স্থানে খুব বেশিদিন বাস করতে পারত না। কারণ, কিছুদিন চাষের পর কৃষিক্ষেত্রগুলি অনুর্বর হয়ে পড়ত। তখন বন কেটে আবার নতুন কৃষিক্ষেত্র রচনা করতে হ'ত। তাই উপজাতিগুলি পুরানো কৃষিক্ষেত্র ছেড়ে নতুন কৃষিক্ষেত্রের কাছে এসে বসবাস করত।

নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এই সমস্যার হাত থেকে কৃষিজীবী সমাজ রক্ষা পেল। কারণ, নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলি নদীর বন্যায় প্রায়ই প্লাবিত হ'ত এবং পলিমাটিতে কৃষিক্ষেত্রগুলি চির-উর্বর থাকত।

অন্যত্র কৃষিজীবী সমাজকে বৃষ্টির মুখাপেক্ষী হ'তে হ'ত। অনাবৃষ্টি হ'লে কৃষিজীবী সমাজে হাহাকার উঠত। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে কৃষিজীবীরা কিন্তু বন্যার জল ধ'রে রেখে কৃষিক্ষেত্রে সেচের সুব্যবস্থা করতে পারত। তাই অনাবৃষ্টির সমস্যাও তাদের আর ছিল না।

নদীতীরবর্তী অঞ্চলে অনেক জলাভূমি থাকায় মাছ ও জলচর পাখি সহজেই পাওয়া যেত। সজল মৃত্তিকায় তৃণাদি পশুখাদ্যও সহজলভ্য ছিল। তাই পশুপালনও সহজ ছিল। ফলে খাদ্যের অভাব হ'ত না।

নদীতে ডোঙা, ভেলা, নৌকা প্রভৃতির সাহায্যে যাতায়াত ও মাল দেওয়া-নেওয়া সহজ ছিল।

এইসব নানা কারণেই নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি মানব সভ্যতার শৈশবের লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল। মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারতের সিন্ধু অঞ্চল এবং চীন দেশের হোয়াং-হো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতাগুলি এর প্রমাণ।

অনুশীলনী

১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ বলতে কি বোঝ? পাথরের তুলনায় তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ারের সুবিধা কি? তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ এখন থেকে কত হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল মনে হয়?

২। মানুষ কিভাবে বিভিন্ন বৃত্তিতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারল?

৩। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন কিভাবে ও কেন হ'ল সমাজে?

৪। মানব-সমাজ কিভাবে শ্রেণী-সমাজে পরিণত হ'ল?

৫। কিভাবে শহরের উৎপত্তি হ'ল?

৬। উপজাতিগুলির মধ্যে সংঘর্ষ হ'ত কেন ?
৭। কিভাবে রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল ? পুরোহিত-রাজা বলিতে কি বোঝ ?
৮। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলেই সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয়েছিল কেন ?

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কি কি ধাতুর মিশ্রণে ব্রোঞ্জ উৎপন্ন হয় ?
২। পাথরের তুলনায় তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরির সুবিধা কি ?
৩। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কোথায় কোথায় মানব সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল ?
৪। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সূচনা হয়েছিল এখন থেকে কতদিন আগে ?
৫। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের সভ্যতাগুলি প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল কোন্ যুগে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪

সুপ্রাচীন সভ্যতা (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০—১৫০০ অব্দ)

১

মেসোপটেমিয়া

১. ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাচীনতা

আরবদেশের উত্তর-পূর্বে ও পারস্যের পশ্চিমে **মেসোপটেমিয়া** অবস্থিত। 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। এই নদী দুটি হল
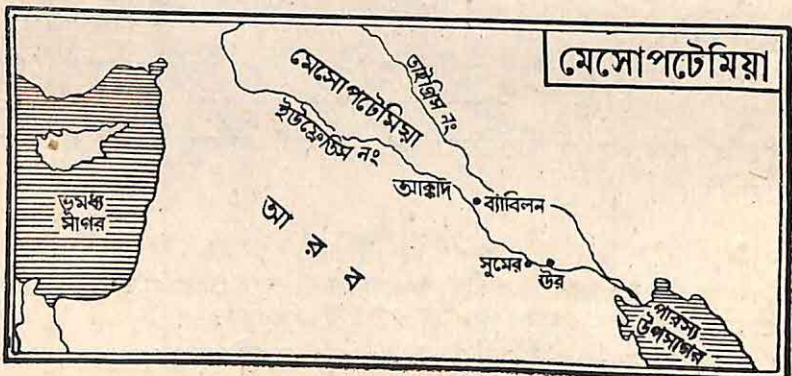
তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস। নদী দুটি উত্তর আর্মেনিয়ার পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পারস্যোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। নদী দুটিতে বছরে বছরে

সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি
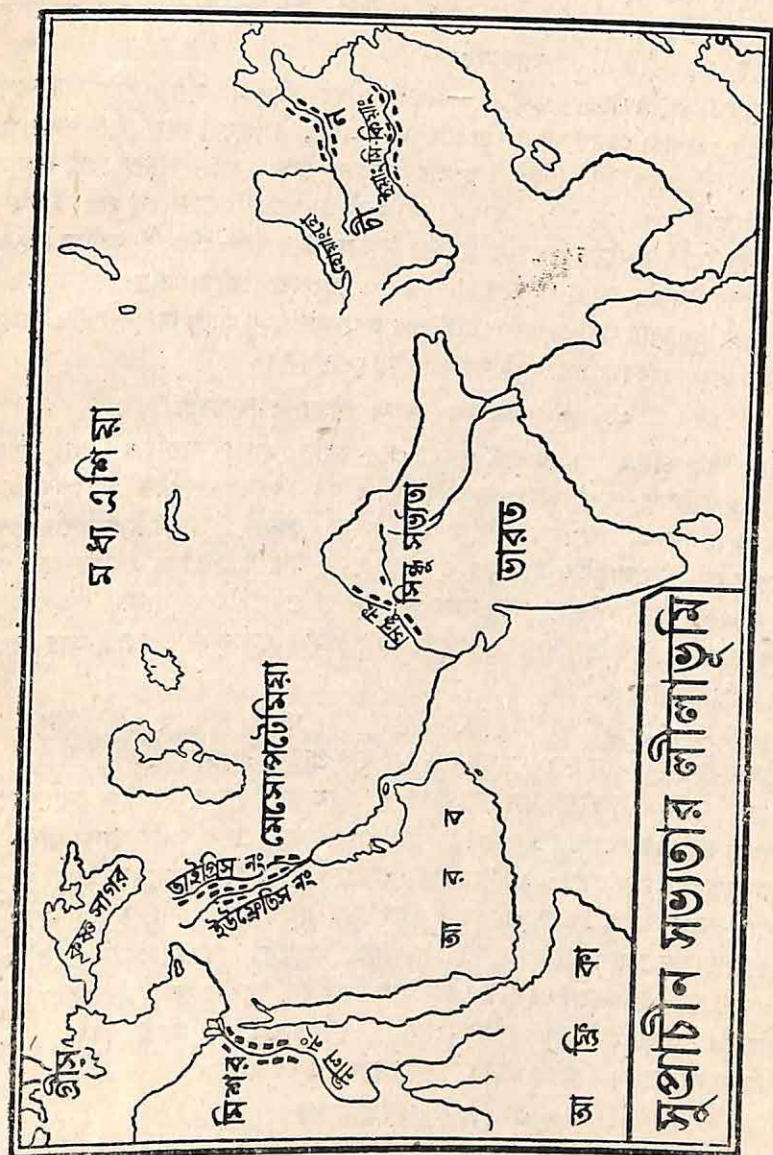
প্রবল বন্যা হওয়ায় স্রোতের টানে পলি এসে জমেছে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, আর পারস্যোপসাগরের কূলে জেগে উঠেছে পালল মৃত্তিকায় গঠিত ব-দ্বীপ। প্রতি বৎসর বন্যার ফলে পলি জমায় এই অঞ্চল চির-উর্বর। নদী দুটির মোহানার কাছে যে উর্বর **ব-দ্বীপটি** গড়ে উঠেছিল, তার নাম **সুমের**।

সম্ভবত পৃথিবীতে এখানেই—অর্থাৎ **সুমেরেই**—সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয়েছিল। এখানে অনেক বড় বড় প্রাচীন টিলা আছে, সেগুলো ছোটখাটো পাহাড়ের মতো। এগুলোকে বলে টেল্। হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে মানুষ একই জায়গায় পর পর বসতি স্থাপন করায় এই জায়গাগুলি অমন উঁচু হয়ে উঠেছে। এক-একটি 'টেল্' খুঁড়ে পর পর মাটির বিভিন্ন স্তরে বিশ-পঁচিশটি বসতির চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। উপরের চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষগুলি তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের। পণ্ডিতদের অনুমান, সুমেরে এখন থেকে প্রায় ছ হাজার বছর আগে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল এবং **পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা** গ'ড়ে তুলেছিল।

২. ভূমির উর্বরতা—ফসল—বন্যানিরোধ-ব্যবস্থা

চির-উর্বর ভূমি ঃ মানুষ যখন এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তখন জলে, কাদায় ও বালিতে পূর্ণ ছিল এর অধিকাংশ স্থান। অনেক জায়গায় ছিল জলাভূমি। চারদিকে ছিল লম্বা লম্বা নলখাগড়া-জাতীয় গাছের জঙ্গল। বালিয়াড়িগুলিতে ছিল খেজুরের বন। জলাভূমিগুলির মাছ ও জলচর পাখি আর বালিয়াড়ির খেজুর জোগাত খাদ্যের একটি মোটা অংশ। সরস সজল উর্বরভূমিতে প্রচুর ঘাস থাকায় গৃহপালিত পশুর খাদ্যের অভাব ছিল না। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল ভূমির উর্বরতা, আর বন্যার ফলে উর্বরতার চির-স্থায়িত্ব।

ফসল ঃ এই উর্বরভূমিতে সহজেই যব ও গমের চাষ হ'ত। তিসি, শণ প্রভৃতিরও চাষ হ'ত মনে হয়। খেজুরের চাষ হ'ত প্রচুর পরিমাণে।

বন্যানিরোধ ঃ নদীতে বন্যার ফলে ভূমি যেমন উর্বর হয়, তেমনি বন্যার ফলে কৃষিক্ষেত্র ও বাসস্থানগুলি ভেসে যায়। তাই এখানে যারা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল, তারা বুঝেছিল, যদি তারা বন্যানিরোধের ব্যবস্থা করে কৃষিক্ষেত্রগুলির জন্যে সেচের ব্যবস্থা করতে পারে, তবে এই অঞ্চল স্বর্গোদ্যান হয়ে উঠবে। কিন্তু বন্যানিরোধ ও সেচব্যবস্থা গড়ে তোলা একার বা সামান্য কিছু লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই অঞ্চলের উপনিবেশকারীদের দীর্ঘকাল সমবেত চেষ্টার ফলে একদা তা সম্ভব হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল কৃষিক্ষেত্রগুলি। কৃষিক্ষেত্রগুলি ক্রমেই বিশাল থেকে বিশালতর হয়েছিল। গ'ড়ে উঠেছিল বহু জনপদ ও নগর।

৩ বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশ

কৃষি ও পশুপালন ঃ কৃষিজীবীরাই এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা এখানে গম ও যবের চাষ করত, পশুপালনও করত। তাই এখানকার বেশীর ভাগ মানুষই ছিল কৃষিজীবী।

শ্রমশিল্প ঃ খননকার্যের ফলে ভূগর্ভে যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, এখানকার লোকে কেবল কৃষিকার্য ও পশুপালনে নয়, অন্যান্য বৃত্তিতেও সুদক্ষ ছিল। তারা সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র রচনা করত। রোদে শুকানো ইঁট দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানাত। এখানকার লোকে বয়নশিল্পেও ছিল বেশ উন্নত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যানবাহনের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাতেও বহু লোক নিযুক্ত থাকত।

সৈনিক ঃ কেরানি ঃ সুমের শস্যসম্পদে পূর্ণ হওয়ায় প্রায়ই সেখানে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যাযাবর উপজাতির লোকেরা এসে হানা দিত। সুমেরে যেসব জনপদ ও নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, সেগুলির মধ্যেও বিবাদ ও যুদ্ধ বাধত। সেজন্যে এক শ্রেণীর লোক যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত হ'ত। এইভাবে একটি সৈনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।

দেশে প্রচুর ধনসম্পদ থাকায় ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলায় হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি রাখার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া অনেক লেখাজোখার কাজও করতে হ'ত। এসব কাজে এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত থাকত। এদের কেরানি শ্রেণী বলা চলে।

পুরোহিত শ্রেণী ঃ প্রত্যেক নগরেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন। ঐ দেবতাকেই সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক মনে করা হ'ত। দেবতার করুণার ওপর সকলে নির্ভর করত। তাই সকলে দেবতাকে প্রসন্ন রাখার জন্যে দেবতার প্রাপ্যরূপে নিজেদের উৎপাদনের একাংশ দিত। ফলে দেবতার শস্যভাণ্ডার পূর্ণ হ'ত এবং দেবতার শস্যভাণ্ডারই জাতির শস্য-ভাণ্ডার হয়ে উঠত। কৃষক ছাড়া অন্যান্য বৃত্তির লোকে ঐ শস্যভাণ্ডার থেকে শস্য পেত এবং বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকত। এইভাবে দেবতার মন্দিরগুলিই দেশের ধনসম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠত। দেবতার অর্চনা, মন্দির সংরক্ষণ, দেবতার সম্পদের তত্ত্বাবধান প্রভৃতির জন্যে একটি **পুরোহিত শ্রেণী** গড়ে উঠত। পুরোহিতদের মধ্য দিয়েই দেবতা তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন, এরূপ ধারণা ছিল মানুষের। পুরোহিতরা নানা দৈবী ও জাদু শক্তির অধিকারী ব'লে লোকে বিশ্বাস করত। তাই সমাজে পুরোহিতরাই ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী শ্রেণী। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতই ছিলেন প্রধান শাসক। তিনি **পুরোহিত-রাজা বা পাটেসি** নামে পরিচিত ছিলেন। পুরোহিত-রাজার নির্দেশে দেশের শাসনব্যবস্থা চলত। শাসনব্যবস্থা চালাবার জন্যে এক শ্রেণীর রাজ-কর্মচারী থাকত। তারা করও আদায় করত।

৪. সুমেরীয়দের কীর্তিকলাপ

সুমের ও আক্কাদের মিলন ঃ সুমেরীয়রা সুমের অঞ্চলে বহু নগর গড়ে তুলেছিল। এক-একটি জনপদের কেন্দ্ররূপে নগরগুলি গড়ে উঠত। নগর ও জনপদগুলি ছিল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। সেগুলির মধ্যে প্রায়ই রেষারেষি, বিবাদ, এমন কি যুদ্ধও ঘটত। নগরগুলির মধ্যে প্রধান ছিল কিশ, উর, এরিদু, লাগাশ

নিপ্পুর প্রভৃতি। এদের এই বিবাদ সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশের পথে ছিল অন্তরায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে লাগাশের নেতৃত্বে সুমের কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সুমেরের বাইরেও কিছু অঞ্চলে সুমেরীয়দের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল।

মেসোপটেমিয়ায় সুমেরের উত্তরে **আক্কাদ** নগরকে কেন্দ্র ক'রে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এখানকার অধিবাসীরা ছিল অন্য জাতির লোক। এদের রাজা **প্রথম সারগন** খ্রীঃ পূঃ ২৭৪০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে সুমের অধিকার করেন। সুমের ও আক্কাদ ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় মেসোপটেমিয়ার একটি সুবিশাল অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠে। রাজা প্রথম সারগন মেসোপটেমিয়ার বাইরেও বহু অঞ্চল জয় করেন। মেসোপটেমিয়ায় পাথর, তামা ও কাঠ পাওয়া যেত না। প্রথম সারগন সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে এবং বিভিন্ন খনি অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে সুমেরে ঐসব বস্তুকে সুলভ ক'রে তোলেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে পথঘাট তৈরি করেন এবং সেগুলিকে দুর্ধর্ষ যাযাবর হানাদারদের হাত থেকে নিরাপদ ক'রে তোলেন।

আক্কাদীয়রা সুমেরীয়দের থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অনুন্নত ছিল। তাই তারা সুমেরীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই গ্রহণ করেছিল। আক্কাদীয় ও সুমেরীয়দের মিলনের ফলে সুমেরীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্রুত বিকাশ লাভ করল।

বিস্ময়কর মিনার ও মন্দির ঃ সুমেরীয় সভ্যতায় ধর্ম, দেবতা ও দেবমন্দিরগুলি একটি প্রধান স্থান অধিকার ক'রেছিল। দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ভূমি-দেবতা **এনলিল**, আর জলদেবতা **এনকি**। সুমেরীয়রা সম্ভবত কোনো পার্বত্য অঞ্চল থেকে এসেছিল। সেখানে তারা পর্বতের চূড়ায় মন্দির বানিয়ে দেবতার অর্চনা করত। সুমেরের সমভূমিতে পর্বত না থাকায় তারা পর্বতের অনুকরণে সুউচ্চ মিনার বানাত। এইসব মিনারকে বলা হ'ত **জিগ্‌গারত**। জিগ্‌গারতের ওপরে থাকত দেবতার মন্দির। বহু মাইল দূর থেকে এই মন্দির দেখা যেত। জিগ্‌গারতের চূড়ায় ওঠার কোনো সিঁড়ি থাকত না ; জিগ্‌গারতের গা ঘিরে থাকত কুণ্ডলীর আকারে পাকানো আলিসা। এই আলিসা দিয়ে মন্দিরে উঠতে হ'ত।

আক্কাদীয়রা অন্য দেবদেবীর পূজো করত। তারা যখন সুমের জয় করল, তখন তাদের দেবতারাও সুমেরীয় সমাজে আরাধ্য হলেন। এইভাবে নগররাষ্ট্রগুলিতে নিজ নিজ অধিষ্ঠাতা দেবদেবীর মিনার ও বহু মন্দির গড়ে উঠল।

মন্দিরগুলি রোদে-শুকানো ইঁট ও আলকাতরা দিয়ে তৈরী করা হ'ত। মন্দির ও মিনারগুলিকে মজবুত করার জন্যে মাটির পোড়া কীলক বা গোঁজ ইঁটের গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত। ঐসব কীলক রঙিন হওয়ায় মন্দির-গাত্রগুলি বিচিত্র শোভা ধারণ করত। মন্দিরগুলির ভেতরে দেওয়ালে থাকত

অপূর্ব সব চিত্র ও কারুকার্য। অনেকসময় ধাতু বা হাতি-দাঁতের ওপর কারুকার্য ক'রে সেগুলিকে আলকাতরা দিয়ে দেওয়ালে এঁটে দেওয়া হ'ত।

অলংকারশিল্প : সুমেরীয়রা সোনা ও ব্রোঞ্জের অলংকার পরত। ব্যবহার করত দুষ্প্রাপ্য পাথর বা রত্ন। লোকে রত্নগুলিকে জাদুশক্তিসম্পন্ন ব'লে বিশ্বাস করত। রত্নগুলিকে অনেক সময় ছিদ্র করা হ'ত, সেগুলিতে নকশা কাটা হ'ত। ঐসব নকশা-কাটা মূল্যবান পাথর লোকে ব্যক্তিগত সীলমোহর-রূপেও ব্যবহার করত। ফলে রত্নকার বা মণিকাররা শিল্পের দিক থেকে খুবই উন্নত হয়ে উঠেছিল।
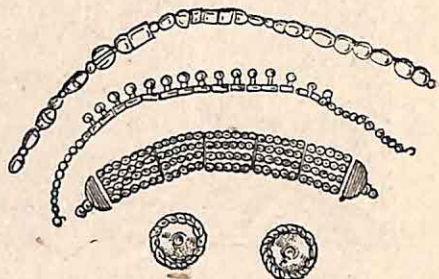
অলংকারশিল্প

ধাতুশিল্প : যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র-শস্ত্র তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হ'ত। পাথর গলিয়ে তামা তৈরি করতে হ'ত। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি হ'ত। তারপরে সেগুলি খুবই উচ্চ তাপে গালিয়ে ছাঁচে ঢেলে জিনিসপত্র তৈরি করা হ'ত। এজন্যে যথেষ্ট রাসায়নিক জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। সুমেরীয়রা ধাতুশিল্পে খুব দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তারা সোনা, রূপা, সীসা প্রভৃতির ব্যবহারও জানত। সুমেরীয় সভ্যতার যুগের ধ্বংসাবশেষে দু-একটি লৌহনির্মিত দ্রব্য পাওয়া গেলেও তখন লৌহের বিশেষ প্রচলন ছিল না।

ব্যবসা-বাণিজ্য : সুমের অঞ্চলে পাথর ও তামা প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যেত না। কাঠও বাইরে থেকে আনতে হ'ত। সুমেরীয়রা নানা শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত। ফলে নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে বিদেশ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি আনতে হ'ত। আমদানি ও রপ্তানির জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন ছিল। সুমেরীয়রা তাই ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই দক্ষ হয়ে উঠেছিল। ঐ সময় আমাদের সিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে প্রয়োজন ছিল উন্নত ধরনের যানবাহন। সুমেরীয়রাই সম্ভবত প্রথম গাড়িতে চাকার ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল। তারা গোরুতে ও গাধায়-টানা গাড়ি ব্যবহার করত। গাধার পিঠে চড়ত, গাধার পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেত। তারা রথের ব্যবহার জানত। তবে ঘোড়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। জলপথে তারা বড় বড় নৌকা ব্যবহার করত। কেবল দাঁড় নয়, পালের ব্যবহারও জানত।

লিপি : সুমেরীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাদের **লিপি**। সুমেরীয়রা তাদের হিসাব ও নানা বিবরণ একরকম অক্ষরে মাটির টালিতে লিখে রাখত। কাঁচা মাটির ওপর কাঠির আঁচড় দিয়ে অক্ষরগুলি লেখা হ'ত। তাই অক্ষরগুলি বাঁকা বা

গোলাকার হ'ত না, হ'ত কীলক বা গোঁজের মতো। এজন্য সুমেরীয় লিপিকে **কিউনিফর্ম** বা **কীলকাকার লিপি** বলা হয়। লেখার পর কাঁচা মাটির টালিগুলি পুড়িয়ে ফেলা হ'ত। তাই এইসব লেখা আজও অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। লিপিগুলি আদিতে সম্ভবত ছবির আকারে ছিল, পরে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক করায় এইরূপ লিপির উদ্ভব হয়েছিল। আজকের কোন লিপির সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। তবু পণ্ডিতরা এইসব লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন। এ বিষয়ে **হেনরি রলিনসন** নামে একজন বৃটিশ সামরিক কর্মচারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পাঠোদ্ধারের ফলে সুমেরীয় ইতিহাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কথাই জানা গেছে।
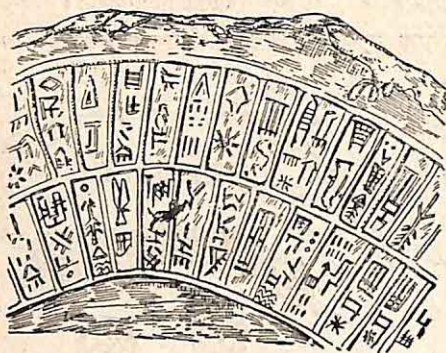
সুমেরীয় কীলকাকার লিপি

অনুশীলনী

১। মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কি? মেসোপটেমিয়া কোন্ কোন্ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এবং কোথায় অবস্থিত?

২। টেল্ বলতে কি বোঝ? টেল্‌গুলি থেকে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার প্রাচীনতা কিভাবে বোঝা যায়?

৩। মেসোপটেমিয়ায় চাষ-আবাদের ব্যবস্থা কিভাবে করা হয়েছিল?

৪। মেসোপটেমিয়ায় পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যের কারণ কি? পুরোহিত-রাজা বলতে কি বোঝ?

৫। সুমেরীয়রা কোন্ দেবদেবীর পুজো করত। জিগ্‌গারত কি? সুমেরীয়রা জিগ্‌গারত কেন গড়ত বলে মনে হয়?

৬। সুমেরের প্রাচীন মিনার ও মন্দির সম্বন্ধে কি জান?

৭। সুমেরীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ কখন হয়েছিল, কেন ও কিভাবে হয়েছিল?

৮। প্রথম সারগন সম্বন্ধে কি জান লিখ?

৯। সুমেরীয়দের ধাতুশিল্প ও অলংকারশিল্প সম্পর্কে কি জান?

১০। সুমেরীয় লিপি সম্পর্কে কি জান?

১১। ঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাওঃ

(ক) সুমেরের উচ্চ মিনারকে বলা হয় পিরামিড / জিগ্‌গারত / স্তম্ভ।
(খ) সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নবপ্রস্তর / তাম্র-ব্রোঞ্জ / লৌহ যুগে।
(গ) সুমেরীয়দের প্রধান দেবতা ছিলেন এন্‌লিল / বেলমার্দুক / আমন-রা।
(ঘ) সুমেরীয় লিপিকে বলা হ'ত হায়েরোগ্লিফিক / ব্রাহ্মী / কিউনিফর্ম।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। সুমের কোথায় অবস্থিত ছিল ?
২। আক্কাদ কোথায় অবস্থিত ছিল ?
৩। আক্কাদের কোন্ রাজা আক্কাদ ও সুমেরকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন ?
৪। সুমেরীয়রা পাহাড়ের অনুকরণে যে দেবমন্দির নির্মাণ করত, তাকে কি বলা হয় ?
৫। প্রাচীন সুমেরীয় লিপির নাম কি ?
৬। সুমেরীয়রা এখন থেকে কত হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল বলে মনে হয় ?
৭। গাড়িতে চাকার ব্যবহার সর্বপ্রথম কারা করেছিল বলে মনে হয় ?
৮। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা কারা গড়ে তুলেছিল ?
৯। সুমেরীয় পুরোহিত-রাজাদের কি বলা হ'ত ?
১০। সুমেরীয় ভূমিদেবতার নাম কি ছিল ?
১১। সুমেরীয় জলদেবতার নাম কি ছিল ?

২

মিশর

১. অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি

নীল নদের উপত্যকা ঃ আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বাংশে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে এবং লোহিত সাগরের পশ্চিমে মিশর অবস্থিত।

মিশরকে দুটি সুনির্দিষ্ট অংশে ভাগ করা যায়। এক, দক্ষিণে নীল নদের দুই তীরে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড। দুই, উত্তরে নদী যেখানে কয়েকটি ধারায় ভূমধ্যসাগরে পড়েছে, সেখানে গঠিত ব-দ্বীপ অঞ্চল। এই দুই অঞ্চল দিয়ে **নীল নদের উপত্যকা** গঠিত। পূর্ব ও পশ্চিম দু দিকেই উচ্চ প্রস্তরময় বিশুষ্ক ভূমি প্রাচীরের মতো এই উপত্যকাকে ঘিরে রয়েছে। এই প্রস্তরময় সুউচ্চ ভূমির পূর্বে রয়েছে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত মরুময় সংকীর্ণ একটি ভূখণ্ড। পশ্চিমে বিস্তৃত রয়েছে শত শত মাইলব্যাপী সাহারা মরুভূমি।

নীল নদের দান ঃ মিশরকে **নীল নদের দান** বলা হয়। নীল নদ আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে **নিউবিয়ার** পর্বতশ্রেণী থেকে প্রবাহিত হয়ে সাহারা মরুভূমির পূর্বাংশের মধ্য দিয়ে উত্তরে বয়ে চলেছে। এই অঞ্চলে পাথরের বুকে গভীর খাতের সৃষ্টি করে এগিয়ে গিয়ে পড়েছে ভূমধ্যসাগরে। প্রতি বছর সুনির্দিষ্ট সময়ে এই নদীতে যে বন্যা আসে, তার ফলে পলি প'ড়ে উর্বর হয়ে উঠেছে নদীর তীরবর্তী অঞ্চল।

এখানে উপযুক্ত সেচব্যবস্থা করতে পারলেই যে এই ভূমি শস্যশ্যামল হয়ে উঠবে, তা প্রাচীনকালের মানুষ বুঝেছিল।

উপনিবেশকারীর মিলিত চেষ্টার ফলঃ এখানে মানুষ কবে কোথা থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তা ঠিক বলা যায় না। তবে তারা যে এখন থেকে ছ-সাত হাজার বছর আগেও এখানে বাস করত, তাতে সন্দেহ নেই। যে সংকীর্ণ
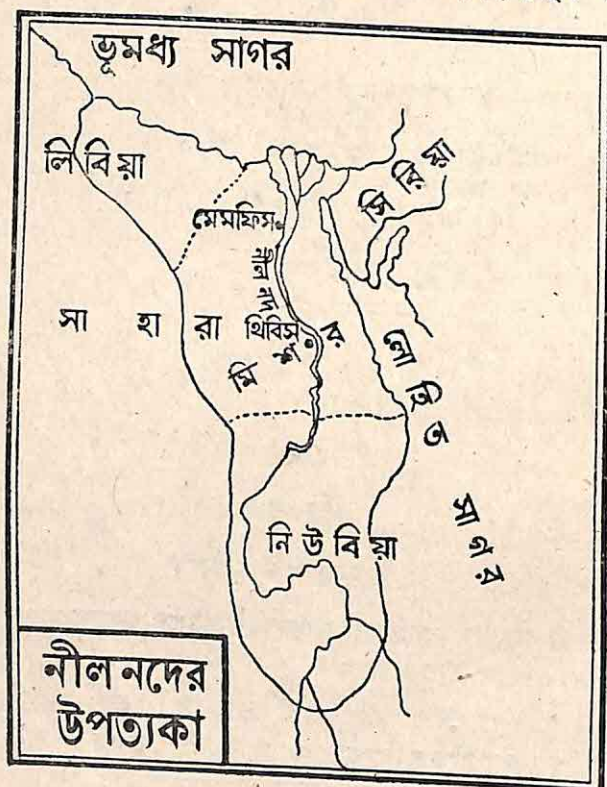
নীলনদের উপত্যকা

ভূখণ্ড এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে সংযুক্ত করেছে, সেই পথে তারা সম্ভবত এখানে এসেছিল, পরে নীল নদের সমগ্র উপত্যকায় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মেসোপটেমিয়ার মতোই নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চল অতিশয় উর্বর। এখানে বৎসরে নির্দিষ্ট সময়ে একবার বন্যা হয়। তাই বন্যা রোধের সমস্যা তেমন নেই। কিন্তু নদীর বুক থেকে তীরবর্তী অঞ্চল কয়েক ফুট উঁচু হওয়ায় এখানে সেচের সমস্যা আছে। তাই বন্যার সময়ে নদী যখন পরিপূর্ণ হয়ে তীরভূমিকে প্লাবিত করে, তখন নদীর জলকে আটকে রেখে এবং নদীর বুক থেকে উপরে সু-কৌশলে জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। এখানে সেচের সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু প্রাচীন মিশরীরা এই সমস্যার সমাধান করেছিল।

এইভাবে ব্যাপক সেচব্যবস্থা গড়ে তোলা একার বা সামান্য কিছু লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নীল নদের তীরে যারা বসতি স্থাপন করেছিল, তারা সমবেত চেষ্টায় নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলকে কৃষিকার্যের উপযোগী করে তুলেছিল। এখানে গম, যব ও শণ ছিল প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

২. ফারাও—পুরোহিত—লিপি—লিপিকর—রাজকর্মচারী—শ্রমিকবাহিনী

ফারাওঃ নীল নদের উপত্যকায় বহু উপজাতি বসতি স্থাপন করেছিল এবং নিজ নিজ জনপদ ও নগর গ'ড়ে তুলেছিল। প্রত্যেক উপজাতির ছিল নিজস্ব দেবতা। এইসব দেবতার আকার ছিল আধা-জন্তু আধা-মানুষ। কোন উপজাতির ছিল **জলহস্তী-দেবতা**, কোন উপজাতির ছিল **কুম্ভীর-দেবতা**, কোন উপজাতির ছিল **শৃগাল-দেবতা**, কোন উপজাতির বা ছিল **বাজপক্ষী-দেবতা**। কোনও উপজাতি অপর উপজাতির উপর আধিপত্য স্থাপন করলে বিজয়ী উপজাতির দেবতাই প্রধান দেবতা-রূপে স্বীকৃতি পেত। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে দুটি উপজাতি অন্যান্য উপজাতিগুলির ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল। এইভাবে দুটি উপজাতির অধীনে নীল নদের উপত্যকায় স্থাপিত হয়েছিল দুটি রাজ্য। দক্ষিণ মিশরীয় রাজ্যের দেবতা ছিল **শ্যেনপক্ষী-দেবতা** এবং উত্তর মিশরীয় রাজ্যের দেবতা ছিল **সর্প-দেবতা**। কিংবদন্তী অনুসারে, দক্ষিণ অংশের রাজা **মেনেস** উত্তর অংশ জয় ক'রে মিশরকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

ঐক্যবদ্ধ মিশরের রাজা **ফারাও** নামে পরিচিত। ফারাও শব্দের অর্থ—'যিনি বড় বাড়িতে থাকেন।' ফারাও উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মিলনের প্রতীক হওয়ায় শ্যেনপক্ষী ও সর্প উভয়েরই মূর্তি তিনি প্রতীকরূপে ধারণ করতেন। ফারাওরা উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মিলনের প্রতীকরূপে একসঙ্গে দুটি মুকুটও পরতেন—উত্তরের প্রতীক লাল মুকুটের ভেতরে থাকত দক্ষিণের প্রতীক সাদা মুকুট।

ফারাও কেবল দুই প্রধান উপজাতির দেবতাদের প্রতীকই ব্যবহার করতেন না; তাঁরা ছিলেন দেবতার জীবন্ত বিগ্রহ।

ফারাওরা দেবতা ব'লে গণ্য হওয়ায় তাঁর বংশ ছিল দেববংশ। ফলে নিজের বংশের বাইরে তাঁর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, অন্যান্য সবাই ছিল সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ। আর তাঁরা ছিলেন দেবতা।

ফারাওরা দেবতা এবং দেববংশজাত ব'লে গণ্য হ'লেও তাঁরা একই বংশের লোক ছিলেন না। মিশরে একত্রিশটি রাজবংশ কয়েক হাজার বছর ধ'রে রাজত্ব করেছিল। কখনও দক্ষিণ মিশর, কখনও উত্তর মিশর ঐক্যবদ্ধ মিশরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। ফলে কখনও উত্তর মিশরের, কখনও দক্ষিণ মিশরের রাজবংশীয় ফারাওরা মিশরে রাজত্ব করতেন।

ফারাও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনিই ছিলেন জীবন্ত দেবতা। তাঁর নির্দেশ পালন ও ইচ্ছা পূরণের জন্যে দেশবাসী প্রাণ দিতেও কাতর হ'ত না।

পুরোহিত ঃ ফারাওয়ের পরে মিশরে সর্বাধিক মর্যাদা পেতেন পুরোহিতরা। মন্দিরের পুরোহিতরা কেবল দেবার্চনা এবং দেবতার ধনসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণই করতেন না, তাঁরা ছিলেন অতিশয় জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। তাঁরা ছিলেন জাদুকর, ভবিষ্যদ্‌বক্তা, চিকিৎসক ও শিক্ষক।

নীল নদে প্রতি বৎসর একই সময়ে বন্যা আসত। ঐ বন্যার দিন থেকে পরবর্তী বন্যা পর্যন্ত দিন গণনা ক'রে তাঁরা জেনেছিলেন ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়। তাঁরা ৩৬৫ দিনকে ৩০ দিনে বিভক্ত ক'রে এক-একটি মাস গণনা করেন। এইভাবে মিশরীয় পুরোহিতরাই বারো মাসে বৎসরের হিসাব চালু করেন। ৩৬৫ দিনকে ৩০ দিন ক'রে বারো মাসে ভাগ করার পর যে ৫ দিন অবশিষ্ট থাকে, সেই পাঁচ দিনকে তাঁরা দেবতার উপাসনা, উৎসব প্রভৃতির জন্যে নির্দিষ্ট করেন। মিশরীয় পুরোহিতরা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম অব্দ-গণনা-ও প্রবর্তন করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৪১ অব্দ থেকে এই অব্দ-গণনা শুরু হয়।

বর্ষগণনা প্রায় নির্ভুল হওয়ায় মিশরীয় পুরোহিতরা আগে থেকেই নীল নদে বন্যা আসার সময় ঘোষণা ক'রে দিতেন। মিশরীয় জনসাধারণ এই ব্যাপারটিকে পুরোহিতদের দৈবী শক্তি মনে করত।

নীল নদে বন্যা আসার সময়ে আকাশে লুব্ধক নক্ষত্রের উদয় হ'ত। তা দেখে তাঁরা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কেও কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং জ্যোতির্বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন।

লিপি ঃ মন্দিরের ধনসম্পদের হিসেব ও বিবরণ লিখে রাখার প্রয়োজন ছিল। ফলে পুরোহিতরা একপ্রকার লিপির উদ্ভাবন করেন। এই লিপি **প্যাপিরাস** নামে একপ্রকার নলখাগড়া-জাতীয় গাছের ডাঁটা জুড়ে তৈরি কাগজের ওপর কালি দিয়ে লেখা হ'ত। এই প্যাপিরাস শব্দ থেকেই ইংরেজী 'পেপার' শব্দের উৎপত্তি।
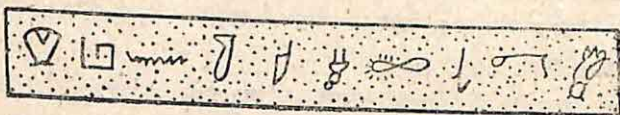
মিশরের হায়েরোগ্লিফিক লিপি বা দেবলিপি

এই লিপি আদিতে চিত্রাক্ষরই ছিল—অর্থাৎ এতে ছবির সাহায্যে কিছু বোঝানো হ'ত। ছবিগুলিকে অতি সংক্ষিপ্ত রেখার টানে সংকেতে বোঝাবার চেষ্টা থেকেই

সুমেরীয় লিপির মতোই এই লিপির উৎপত্তি হয়। পরে লিপিগুলি কেবল চিত্র-সংকেতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাকে ধ্বনির সংকেত রূপেও ব্যবহারের চেষ্টা হয়। এইসব লিপি মন্দিরের পুরোহিতরা বিশেষভাবে ব্যবহার করায় এগুলি **হায়েরোগ্লিফিক** নামে পরিচিত। হায়েরোগ্লিফিক শব্দের অর্থ **দেবলিপি** বা **পবিত্রলিপি**।

এই দেবলিপিতে লেখা কয়েক হাজার বছরের বহু বিবরণ মিশরে পাওয়া গেছে। এই লিপির সঙ্গে আধুনিক কোনও লিপির মিল নেই। মিশরে **রসেটা** নদীর মোহানার কাছে একটি কালো পাথর পাওয়া যায়। এই কালো পাথরে তিন রকম লিপিতে একই কথা লেখা ছিল। তাদের মধ্যে একটি গ্রীক, একটি হায়েরোগ্লিফিক। গ্রীক লিপি ও ভাষা অজানা নয়। তাই হায়েরোগ্লিফিকে সেই কথাগুলি কিভাবে লেখা হয়েছে তা জানার সূত্র ধ'রে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা চলে। শেষ পর্যন্ত ফরাসী অধ্যাপক **শাপলিঁয়** এই চেষ্টায় সফল হন। ফলে কয়েক হাজার বছরের মিশরীয় ইতিহাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কথা জানা যায়।
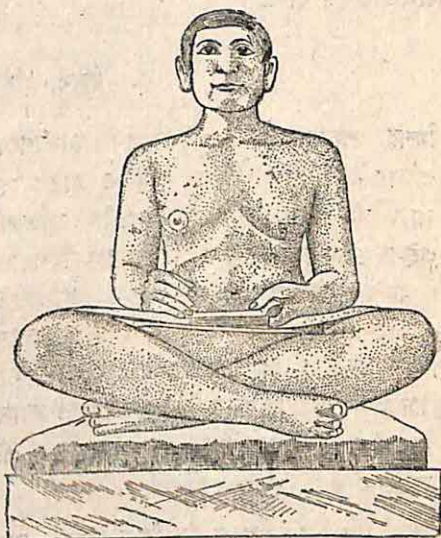
মিশরীয় লিপিকর

লিপিকর ঃ মিশরে লিপি প্রচলিত থাকায় হিসেব-নিকেশ, বিবরণ, অনুশাসন প্রভৃতি লেখার জন্যে এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত থাকত। লেখাই ছিল এদের পেশা। এরা **লিপিকর** নামে পরিচিত। এরাই ছিল তখনকার দিনের শিক্ষিত সম্প্রদায়।

রাজকর্মচারী—কর-সংগ্রাহক ঃ এই শিক্ষিত সম্প্রদায় তখনকার দিনে নানা-প্রকার রাজকার্যে নিযুক্ত থাকত। বিশেষ ক'রে প্রজাদের কাছে রাজকর আদায়ের কাজে। তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়নি। তাই প্রজারা রাজকররূপে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ দিত। ঐসব উৎপন্ন দ্রব্য রাজভাণ্ডারে জমা হ'ত। রাজকর-সংগ্রাহকরা রাজকর আদায় করত, তার হিসেব-নিকেশ ও বিবরণ রাখত।

শ্রমিক-বাহিনী ঃ—মিশরের ফারাওরা দেশে অসংখ্য নির্মাণকার্য করেছিলেন তাতে তাঁরা রাজকর থেকে সংগৃহীত সম্পদ ব্যয় করতেন। প্রাসাদ, মন্দির, পিরামিড, পথঘাট প্রভৃতির নির্মাণকার্যে হাজার হাজার শ্রমিককে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নিয়মিত নিয়োগ করা হ'ত। এই শ্রমিকবাহিনীগুলি অনুৎপাদক কাজে নিযুক্ত থাকত। রাজভাণ্ডার ও দেবভাণ্ডার থেকেই এরা নিয়মিত মজুরি পেত। এদের জীবিকার কোন চিন্তা ছিল না। এই কাজে অসংখ্য ক্রীতদাসও নিযুক্ত থাকত।

৩. ব্যবসা-বাণিজ্য

মিশর শস্য-সম্পদে পূর্ণ ছিল। নির্মাণকার্যের জন্যে প্রয়োজনীয় পাথরেরও তার অভাব ছিল না। কিন্তু কাঠ ও ধাতব সম্পদ, মূল্যবান্ রত্নাদি তার বেশি ছিল না। মিশরীরা, বিশেষত মিশরীয় অভিজাত সম্প্রদায়, অত্যন্ত বিলাসী ছিল। তাই এইসব প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বিলাসদ্রব্য মিশরীদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হ'ত। মিশরে উৎপন্ন হয় না এমন বহু জিনিসই মিশরীদের কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, চোখে অঞ্জন ব্যবহার মিশরীদের কাছে অত্যাবশ্যক ছিল। কেবল প্রখর রৌদ্র ও শুষ্ক আবহাওয়ায় চোখ ভালো রাখার জন্যে মিশরীরা অঞ্জন ব্যবহার করত না। তারা বিশ্বাস করত অঞ্জনের জাদুগুণ আছে। তাই মিশরীরা বহু মূল্য দিয়েও দূর দেশ থেকে এই অঞ্জন তৈরির জন্যে ম্যালাকাইট নামে সবুজ ধাতু সংগ্রহ করত।

মিশরী বণিকরা দক্ষিণে নিউবিয়া থেকে মূল্যবান্ কাঠ, হাতির দাঁত, সোনা, সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি আনত। তারা প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতির সংগে ব্যবসা করত। তাদের বাণিজ্যতরী ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিয়ে ক্রীট ও সাইপ্রাস দ্বীপে যেত। তারা বাণিজ্যের সুবিধের জন্যে লোহিত সাগরের সঙ্গে নীল নদের একটি শাখাকে সংযুক্ত ক'রে দিয়েছিল। একটি প্রায় চার হাজার বছর আগেকার **সুয়েজ খাল** বলা চলে। তারা সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্যে বড় বড় জাহাজ ব্যবহার করত। জাহাজগুলি দাঁড় ও পালের সাহায্যে চলত। তখন দেশে মুদ্রা প্রচলিত ছিল না। সমস্ত ব্যবসাই বিনিময়ের মাধ্যমে হ'ত। অনেক সময় সোনা, রূপা ও মূল্যবান্ রত্নাদিও কেনাবেচার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হ'ত।

৪. ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা

সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। আবার প্রকৃতির দানেই মানুষ অপরিমিত সুখ-সম্পদের অধিকারী হয়েছে। মানুষ জলে

স্থলে হিংস্র শ্বাপদ ও সরীসৃপের সঙ্গে লড়াই করেছে। অনেক জীবজন্তুর কাছে উপকৃতও হয়েছে। আর একটি জিনিস সুপ্রাচীন কাল থেকে তাদের বিচলিত করেছে—তা হ'ল মৃত্যু। মৃত্যুতেই কি জীবনের শেষ? মৃত্যুর পরে কি আছে? মৃত্যুর পরে মানুষ কি করে? এইসব তারা চিন্তা করেছে।

এই সমস্ত ব্যাপার প্রাচীন কালের মানুষের ধর্মীয় চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে গ'ড়ে তুলেছিল। নীল নদের উপত্যকায় যেসব মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল, তাদেরও চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে এইসব বিষয় প্রভাবিত করেছিল। তাই গোড়ার যুগে দেখা যায়, নীল নদের উপত্যকায় যেসব উপজাতি বসতি স্থাপন করেছিল, তারা নিজ নিজ পারিপার্শ্ব অনুসারে নিজ নিজ দেবতা সৃষ্টি করেছিল।
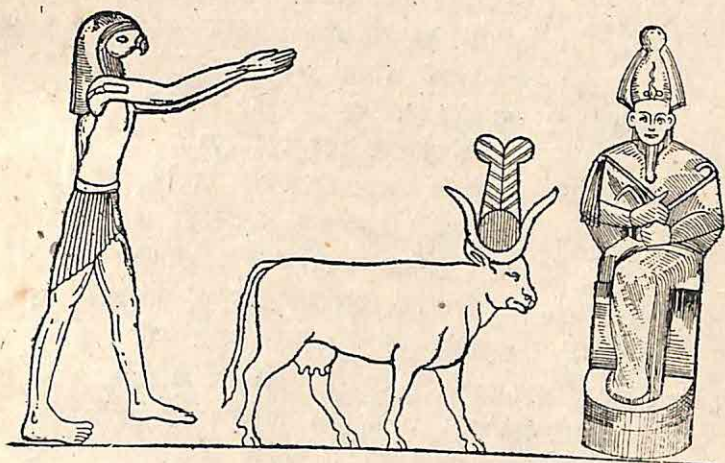
মিশরীয় দেবদেবী

এই সমস্ত দেবতাদের তারা কল্পনা করেছিল অর্ধমানুষ ও অর্ধজন্তু-জানোয়ারের মূর্তিতে। এইভাবে বিভিন্ন উপজাতির ছিল জলহস্তী-দেবতা, বৃষ-দেবতা, গাভী-দেবতা, কুম্ভীর-দেবতা, শৃগাল-দেবতা, শ্যেন-দেবতা, সর্প-দেবতা, শকুন-দেবতা ইত্যাদি। পরে উপজাতিগুলি যখন শ্যেন-পক্ষীর উপাসক উপজাতির রাজার শাসনাধীন হয়েছিল, তখন শ্যেন-দেবতা **হোরাস** প্রধান দেবতারূপে পূজিত হয়েছিলেন। শ্যেন-পক্ষী আকাশবিহারী; তাই শ্যেন-দেবতা **হোরাস** আকাশ-দেবতাও হয়ে উঠেছিলেন। মিশরীরা অন্যান্য বহু প্রাচীন জাতির মতোই এই বিশ্বাসও করত যে, সূর্যই জীবন, ধনসম্পদ ও সুখসৌভাগ্যের উৎস। তাই সূর্যকেও তারা প্রধান দেবতারূপে পুজো করতে শুরু করেছিল। ফলে একসময়

আকাশচারী শ্যেন-দেবতা **হোরাস** এবং সূর্য-দেবতা **আমন-রা** এক হয়ে গেলেন। অন্যান্য দেবদেবীর কল্পনাও চলতে লাগল।
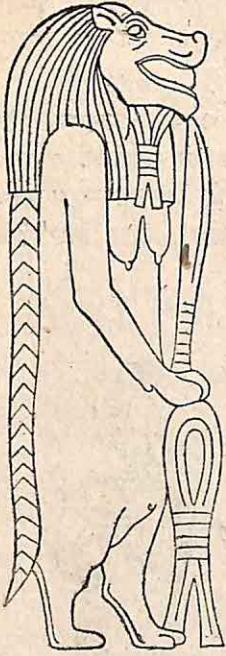
দেবদেবীদের নিয়ে বহু পৌরাণিক কাহিনী গড়ে উঠল। পুরাণকাহিনীতে আবার হোরাসকে সূর্য-দেবতার প্রপৌত্র রূপে কল্পনা করা হ'ল। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে, মিশরের দুই প্রধান দেবতা **ওসিরিস** ও **আইসিস** হলেন সূর্যের পৌত্র ও পৌত্রী। এঁরা ভাই-বোন এবং স্বামী-স্ত্রী। ওসিরিস হলেন নীল নদের অধিষ্ঠাতা এবং মৃত্যু ও পুনর্জন্মের দেবতা। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে মিশরীরা গভীরভাবে বিশ্বাসী হওয়ায় ওসিরিস অন্যতম প্রধান দেবতার আসন পান। এঁকে বৃষ-দেবতা **ওপিস** এবং সূর্য-দেবতা **আমনের** সঙ্গেও এক ক'রে ভাবা হয়। গাভী-দেবতা ও চন্দ্রদেবতা **হাথর** ও **আইসিস** পরে একই দেবীরূপে পূজিতা হন। তিনি ধরিত্রী ও সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মিশরীরা আরও বহু দেবদেবীর কল্পনা করেছিলেন এবং তাদের ঘিরে বহু পৌরাণিক কাহিনী গড়ে উঠেছিল।

মিশরীয় জলহস্তী-দেবতা

মিশরে দেব-দেবীর উদ্দেশে বহু মন্দির নির্মিত হয়। ফারাওরা মন্দিরনির্মাণে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। প্রস্তরনির্মিত এইসব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখলে বোঝা যায়, মিশরীরা স্থাপত্যশিল্পে কী বিস্ময়কর উন্নতিলাভ করেছিল। দেবদেবী ও ফারাওদের বহু প্রস্তরনির্মিত অপূর্ব মূর্তি এবং ঐ সব দেব-মন্দির আমাদের আজও স্তম্ভিত করে।

৫. পিরামিড

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস : মিশরীরা মৃত্যুকেই জীবনের শেষ ব'লে মনে করত না। মনে করত, মৃত্যুর পরেও মানুষের আর এক জীবন আছে, সে জীবন জীবিত মানুষের জীবনের মতোই। তাই তারা মনে করত, মরার পরেও মানুষের বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, পরিচ্ছদ, বিলাস-দ্রব্য, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, সকল কিছুরই প্রয়োজন হয়। তাই এ সমস্ত জিনিসই তাদের কবরে দেওয়া চাই। অভিজাত ব্যক্তি বা রাজারাজড়া হ'লে দাসদাসী, অনুচর-পরিচরেরও দরকার থাকে। গোড়ার দিকে তাই ফারাও ও অভিজাত ব্যক্তিদের কবরে তাদের দাসদাসী, অনুচর-পরিচরকে হত্যা ক'রে কবর দেওয়া হ'ত। পরে তাদের হত্যা না করে মূর্তি বানিয়ে দেওয়া হ'তে থাকে।

মৃতদেহ সংরক্ষণ : এরা মনে করত, যতদিন মৃতদেহ বর্তমান থাকবে, ততদিন এরা মৃত্যুর পরও জীবন ধারণ করবে। তাই মৃতদেহগুলি যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্যে তারা সচেষ্ট ছিল। মৃতদেহগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে মিশরীরা মৃতদেহগুলিকে সোরার জলে ডুবিয়ে রেখে তার নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি বার ক'রে নিয়ে আলকাতরায় ভরে দিত। তারপর সারা দেহে পাতলা কাপড় জড়িয়ে আলকাতরার প্রলেপ দিত। আলকাতরাকে আরবী ভাষায় বলে **মুমিআই**। তাই আলকাতরার সাহায্যে রক্ষিত এইসব মৃতদেহকে বলে **মমি**। তারপর এই মমিকে কবর দেওয়া হ'ত। ফারাও ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মমি ক'রে কবর দেওয়া হ'ত।

একটি মিশরীয় মমি

পিরামিড : ফারাওরা বা অভিজাত ব্যক্তিরা তো সাধারণ কবরে থাকতে পারেন না। তাঁদের কবর হওয়া চাই রাজপ্রাসাদের মতো বহুকক্ষবিশিষ্ট বাসগৃহ। এইরূপ বড় বড় বাসগৃহ নির্মাণ ক'রে তার ওপর পর্বতপ্রমাণ উঁচু যেসব ত্রিকোণাকার পাথরের স্তূপ নির্মিত হ'ত, তারই নাম **পিরামিড**। পিরামিডগুলি আসলে এক-একটি সমাধিমন্দির।

ফারাওরা নিজেদের সমাধিমন্দির নিজেরাই তৈরী ক'রে যেতেন। এইসব পিরামিডের অনেকগুলি আজও বর্তমান আছে। এখান থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে চতুর্থ রাজবংশের ফারাও **খুফু**, **খেফ্রেন** ও **মাইসেরিনাস** নীল নদের পশ্চিমে গিজে নামক স্থানে যে তিনটি পিরামিড তৈরি করেছিলেন, সেগুলিই সর্ববৃহৎ। এগুলির মধ্যে আবার বৃহত্তম হ'ল খুফু-নির্মিত পিরামিডটি। এটি **মহা পিরামিড** নামে পরিচিত।

এটির তলদেশ তের একর এবং উচ্চতা সাড়ে চার শ ফুট। এর তলদেশের এক-এক দিকের দৈর্ঘ্য সাত শ ফুট। এটি নির্মাণ করতে প্রায় আড়াই টন ওজনের তেইশ লক্ষ পাথরের টুকরো লেগেছে। পাথরগুলি এমন নিখুঁতভাবে বসানো হয়েছে যে, দুটি পাথরের মধ্যে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগও ফাঁক নেই। কিভাবে যে ঐ পাথরগুলিকে সেই যুগে অত উঁচুতে তোলা হয়েছিল, তা ভেবে

পাওয়া যায় না। কাছে-পিঠে কোথাও ঐ ধরনের পাথর নেই। পাথরগুলিকে নীল নদের পূর্ব পার থেকে আনতে হয়েছিল। সম্ভবত নদী যখন ভরপুর থাকত, তখন কাঠের ভেলায় সেগুলিকে আনা হয়েছিল। ঐগুলিকে নদীতীর থেকে গিজে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া ছিল এক সমস্যা। মানুষের মেহনতেই তা করতে হয়েছে। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক হেরোডটাস বলেছেন, ঐ পিরামিড তৈরি
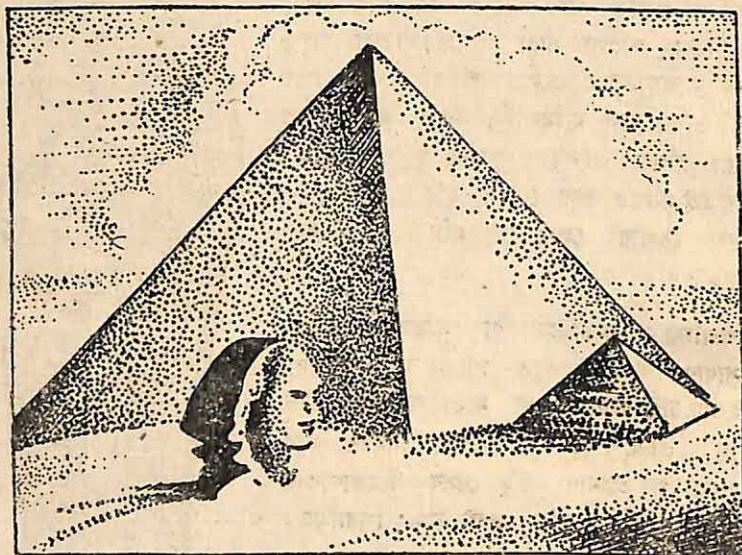
গিজেতে অবস্থিত খুফু-নির্মিত মহা পিরামিড

করতে এক লাখ লোক বিশ বছর কাজ করেছিল। ঐসব মানুষকে রাজভাণ্ডার থেকে মজুরি দেওয়া হ'ত। এক-একটি পিরামিড নির্মাণে দেশের সম্পদ যে কীভাবে ব্যয় হ'ত, এ থেকে তা অনুমান করা যায়। এ-ও বোঝা যায়, দেশবাসী ফারাওদের কী পরিমাণে ভক্তি করত। পিরামিডগুলি প্রাচীন মিশরীদের গঠনপ্রতিভার আশ্চর্য নিদর্শন।

এইসব পিরামিডের নিচেকার কক্ষগুলিতে ফারাওয়ের ব্যবহার্য সমস্ত জিনিস এবং বিপুল ধনরত্ন রাখা হ'ত। পরবর্তীকালে ঐসব ধনরত্ন ও মূল্যবান বস্তু সবই চুরি হয়ে গেছে। একটিমাত্র পিরামিডের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা থেকে কোন জিনিস খোয়া যায়নি। সেটি ফারাও তুতেন্‌খামেন-এর পিরামিড।

৬. প্রধান বৃত্তিসমূহ

মিশরীরা প্রধানত ছিল কৃষিজীবী। নীল নদে যখন বন্যা আসত তখন কিছুদিন তাদের কৃষিকার্যের সুযোগ থাকত না। ঐ সময় তারা নির্মাণকার্যে নিযুক্ত থাকত। নির্মাণকার্যের জন্যে দক্ষ স্থপতি ও নির্মাণশিল্পীরও অভাব ছিল না।

মূর্তিনির্মাণেও বহুলোক নিযুক্ত থাকত। ঐ যুগে ভাস্কর্য বা মূর্তিনির্মাণশিল্প যে কত উন্নত ছিল, তা ঐ যুগের মূর্তিগুলি দেখলেই বোঝা যায়। দেশের বহু মানুষ মৃৎশিল্পে নিযুক্ত থাকত। প্রাচীন মিশরে মৃৎশিল্প খুবই উন্নত ছিল। মৃৎপাত্রগুলি গঠনসুষমায় কেবল সুন্দর ছিল না, ছিল বর্ণবিচিত্র এবং বহুবিধ চিত্রে পূর্ণ। ঐসব ছবি দেখে ঐ যুগের সমাজের বহু দিক সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি। বয়নশিল্পেও মিশরীরা ছিল খুবই উন্নত। তুলো ও পশমের সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও পোশাক তারা তৈরি করত। মিশরীরা অত্যন্ত বিলাসী ছিল, তাই বিলাসদ্রব্য উৎপাদনেও বহু লোক নিযুক্ত থাকত। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, হাতিদাঁত প্রভৃতির বহু শৌখিন জিনিস ও অলংকার তারা তৈরি করত। মিশরী অভিজাত শ্রেণী বহুমূল্য রত্নও ব্যবহার করত। মণিকারের কাজেও মিশরীরা খুবই দক্ষ ছিল। সম্ভবত মিশরীরাই সর্বপ্রথম কাচ ও কাচশিল্প আবিষ্কার করেছিল।

মিশরীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে বহু লোক নিযুক্ত থাকত। সওদাগরি থেকে ছোট দোকানদারি পর্যন্ত নানা কাজ তারা করত।

নৌচালনায় ও নৌবাণিজ্যে মিশরীরা খুবই দক্ষ ছিল। নৌচালনায় বহু লোক নিযুক্ত থাকত। পরিবহণব্যবস্থাও খুবই উন্নত ছিল। তাতেও বহুলোক নিযুক্ত থাকত।

মিশরীরা যুদ্ধেও পারদর্শী ছিল। বহু মিশরী যোদ্ধার বৃত্তি নিত।

মন্দিরে দাসদাসী ও পরিচারক-পরিচারিকার কাজে বহু লোক নিযুক্ত থাকত। রাজকর্মচারীরূপে বহু লোক কাজ করত। হিসাব-নিকাশ ও বিবরণ রাখার কাজও করত বহুলোক। লিপিকরের কাজ মিশরে যথেষ্ট মর্যাদা পেত।

অনুশীলনী

১। মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন?

২। নীল নদের উপত্যকা বলতে কি বোঝ? এখানে চাষের সুবিধে ও অসুবিধে কি?

৩। 'ফারাও' শব্দের অর্থ কি? ফারাও সম্বন্ধে কি জান?

৪। মিশরের দেবদেবী সম্পর্কে কি জান? হোরাস, ওসিরিস ও আইসিস সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। মিশরীয় লিপি সম্বন্ধে কি জান? প্যাপিরাস কি?

৬। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বর্ষগণনা করেছিলেন কারা ও কিভাবে? মিশরীয় অব্দ গণনা কবে থেকে শুরু হয়েছিল?

৭। মিশরীয় পুরোহিতরা জ্যোতির্বিদ্যায় কিভাবে দক্ষতা লাভ করেছিলেন?

৮। মমি বলতে কি বোঝ?

৯। পিরামিড কি? মিশরের বড় বড় পিরামিডগুলি কোথায় অবস্থিত? মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি কে তৈরি করেছিলেন?

১০। পিরামিড সম্পর্কে যা জান লেখ। কোন্ পিরামিডের জিনিসপত্র চুরি যায়নি?

১১। বাক্যাংশগুলি সাজিয়ে বাক্য রচনা কর ঃ

হায়েরোগ্লিফিক শব্দের অর্থ	যিনি বড় বাড়িতে বাস করেন
মিশরকে প্রথম ঐক্যবদ্ধ করেন	ফারাও খুফু
ফারাও শব্দের অর্থ	পবিত্রলিপি বা দেবলিপি
মহাপিরামিড নির্মাণ করেন	ফারাও মেনেস

১২। ঠিক উত্তরের তলায় দাগ দাও ঃ

(ক) নীল নদে বন্যা আসার সময়ে উদয় হ'ত লুব্ধক / কালপুরুষ / ধ্রুব নক্ষত্র।

(খ) মিশরের লিপিকে বলা হয় কীলকাকৃতি লিপি / দেবলিপি / ব্রাহ্মীলিপি।

(গ) প্রাচীন মিশরীরা লিখত বাঁশের পাতলা ছিলায় / প্যাপিরাসের পাতলা ডাঁটায় / কাঁচা মাটির ফলকে।

(ঘ) পৃথিবীতে প্রথম বর্ষগণনা করে সুমেরীয়রা / মিশরীরা / সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। মিশর কোন্ মহাদেশে অবস্থিত? এর পশ্চিমে কোন্ মরুভূমি ও উত্তরে কোন্ সমুদ্র আছে?
২। নীল নদে বৎসরে ক-বার বন্যা হ'ত? বন্যার সময়ে কোন্ নক্ষত্র উদিত হ'ত?
৩। মিশরের রাজাকে কি বলা হ'ত?
৪। 'ফারাও' কথার মানে কি?
৫। মিশরের শ্যেনপক্ষী-দেবতার নাম কি ছিল?
৬। মিশরের প্রধান দুই দেব-দেবীর নাম কি?
৭। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি কার তৈরি?
৮। কোন্ পিরামিডের জিনিসপত্র চুরি যায়নি?
৯। মিশরের লিপির নাম কি?
১০। প্রাচীন মিশরীরা কিসের ওপর লিখত?
১১। ৩৬৫ দিনে যে বৎসর হয়, তা সর্বপ্রথম কারা আবিষ্কার করেছিল?
১২। বৎসরকে বারো মাসে সর্বপ্রথম কারা বিভক্ত করেছিল?
১৩। পৃথিবীতে অব্দগণনা সর্বপ্রথম কারা আরম্ভ করেছিল? কবে থেকে মিশরে অব্দগণনা শুরু হয়?

৩

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

১. আবিষ্কার—আবিষ্কৃত দ্রব্য—প্রাচীনতা

আবিষ্কার ঃ আগে ভাবা হ'ত, আর্য সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। ইংরেজ আমলে পাঞ্জাবে ও সিন্ধু প্রদেশে রেলরাস্তা তৈরির জন্যে ইঁট-পাথরের সন্ধান করতে গিয়ে উঁচু উঁচু ঢিপি চোখে পড়ে। মেসোপটেমিয়ায় টেল্ বা টিলা খুঁড়ে সুপ্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এখানেও সেই রকম কিছু পাওয়া যেতে পারে মনে ক'রে মাটি খোঁড়া শুরু হয়। ফলে এখন থেকে প্রায় ষাট বছর আগে **সিন্ধু** নদের তীরে **মহেন্‌জোদড়োয়** এবং **রাবি** নদীর তীরে **হরপ্পায়** দুটি সুপ্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। মহেন্‌জোদড়ো শব্দের অর্থ মৃতের স্তূপ।

মহেন্‌জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ প্রথম আবিষ্কার করেন **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন **দয়ারাম সাহানী**। পরে আশপাশের

বহু অঞ্চলেও খননকার্য চালানো হয়। ফলে জানা যায়, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলে এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে একটি সুপ্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধুনদ ও তার উপনদীগুলির তীরে এই সভ্যতা গড়ে ওঠায় এই সভ্যতার নাম দেওয়া হয়েছে **সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা** বা সংক্ষেপে **সিন্ধু সভ্যতা**।

আবিষ্কৃত দ্রব্য ও প্রাচীনতা ঃ এই অঞ্চল এখন বিশুষ্ক হ'লেও একদা এখানে প্রচুর বৃষ্টি হ'ত। নদীগুলিতে বন্যা নামত। মৃত্তিকা ছিল উর্বর। মহেন্‌জোদড়োতে প্রায় এক বর্গমাইল জায়গা খোঁড়া হয়েছে। সেখানে মাটির তলায় পর পর কয়েকটি স্তরে কয়েকটি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সম্ভবত নদীর প্রবল বন্যায় একটি শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পরে যখন পলিমাটি প'ড়ে সেই শহরের চিহ্ন লোপ পেত, তখন তার ওপর আবার নতুন
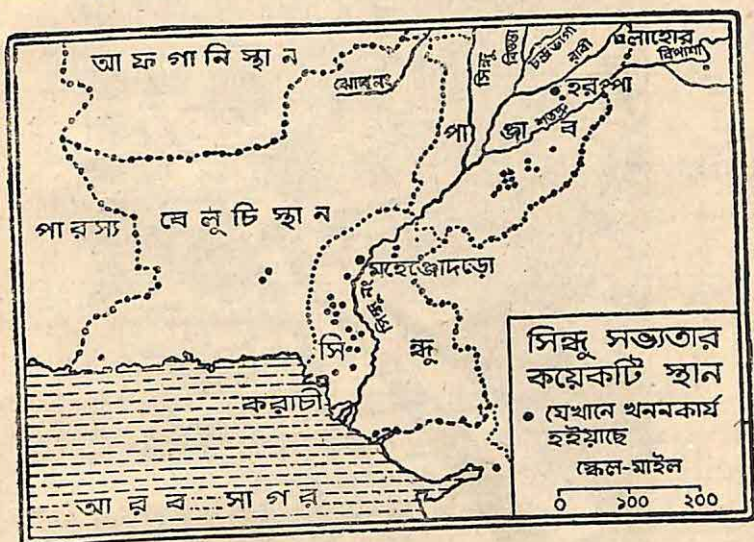
ক'রে শহর বানানো হ'ত। এইভাবে একটি শহরের ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন ক'রে আবার একটি শহর গড়ে তুলতে নিশ্চয় বহু শতাব্দী লাগত। তাই নিশ্চয় কয়েক হাজার বছর আগে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই বিস্তৃত অঞ্চলে অনেক জায়গায়, বিশেষত মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পায়, খননকার্যের ফলে একই ধরনের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, মৃৎপাত্র, গৃহ, খাদ্যাবশেষ, সীলমোহর, খেলনা, মূর্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী বহু জিনিস পাওয়া গেছে। কিন্তু লোহার তৈরি কিছু পাওয়া যায়নি। এ থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মতোই তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেই এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

২. নগর-পরিকল্পনা

নাগরিক সভ্যতা ঃ সিন্ধু অঞ্চলে মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মতোই নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ দেশে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের খুবই উন্নতি হওয়ায় বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল। মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পা ছিল তেমনি দুটি বড় শহর।

পথঘাট ঃ খননকার্য চালিয়ে দেখা গেছে, শহরগুলি এলোপাথাড়ি গড়ে ওঠেনি। কে বা কারা যেন বেশ ভেবেচিন্তে মাপজোখ ক'রে শহরগুলি গড়ে তুলেছিল।
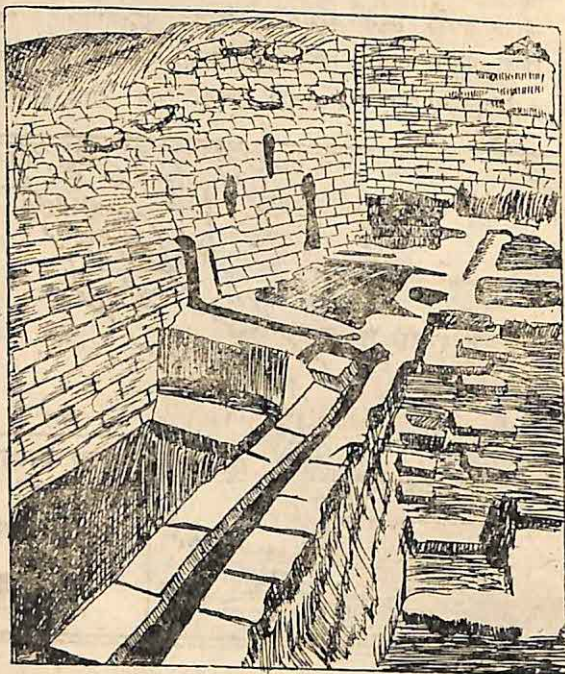
মহেন্‌জোদড়োয় ঢাকা নর্দমা

শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে দীর্ঘ প্রশস্ত প্রধান রাজপথ। রাজপথটি ৩৩ ফুট চওড়া। তা থেকে বেরিয়েছে সোজা, চওড়া ও সমান্তরাল বহু পথ। পথের ধারে ঢাকা নর্দমা। সবত্রই পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সতর্কতা। প্রত্যেক বাড়ির সামনে উঠান ও আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা।

গৃহ ঃ পথের পাশে সারিবদ্ধ সব বাড়ি। দু-কামরাওয়ালা ছোট বাড়ি থেকে প্রাসাদোপম বড় বড় বাড়িরও সন্ধান পাওয়া গেছে। দু-তিনতলা বাড়িরও ধ্বংসাবশেষ আছে। উপরের তলা থেকে মলমূত্র নির্গমের ব্যবস্থা ছিল।

বাড়িগুলি রোদে শুকানো ও আগুনে পোড়ানো ইঁট দিয়ে তৈরি। বড় বড় থামওয়ালা কতকগুলি দালানও বার হয়েছে। এগুলি সভাগৃহ ছিল ব'লে মনে হয়। ঐসব দালান দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় আশি ফুট। হরপ্পায় একটি বিরাট বাড়ির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এটি নগরের শস্যাগার ছিল মনে হয়। মহেন্‌জোদড়োয় বা হরপ্পায় কোনও মন্দির পাওয়া যায়নি।
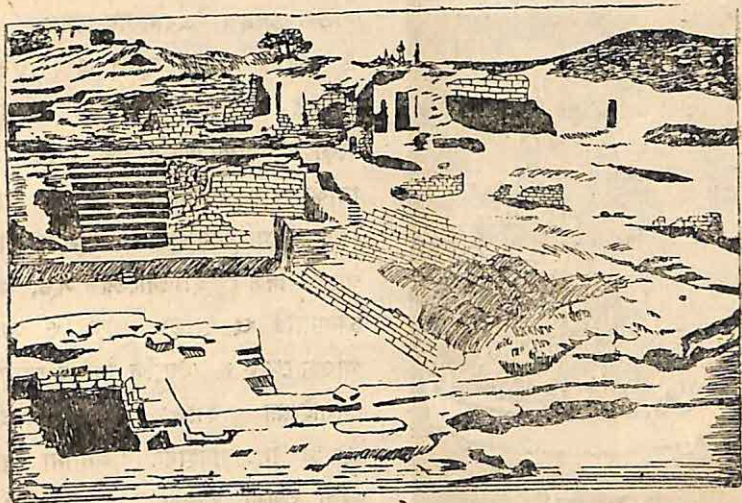
মহেন্‌জোদড়োয় আবিষ্কৃত স্নানাগার

পরিচ্ছন্নতা ও বিলাস ঃ সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা যে খুবই পরিচ্ছন্ন ও শৌখিন ছিল, তা বোঝা যায় মহেন্‌জোদড়োর **বৃহৎ স্নানাগারটি** থেকে। এখানে যে স্নানাগারটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি লম্বায় ১৮০ ফুট ও চওড়ায় ১০৮ ফুট। এর চারদিকেই ছিল ৮ ফুট পুরু দেওয়াল। স্নানাগারের মধ্যে ছিল ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া, ৮ ফুট গভীর একটি চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাটির তলা বেশ শক্ত ক'রে বাঁধানো। চৌবাচ্চায় নামার জন্যে দুদিকে সিঁড়ির পাট। চৌবাচ্চার চারদিকে গ্যালারির মতো বসবার জায়গা। গ্যালারির পেছনে বহু কামরা ও কামরার ভেতরে কূপ। কূপ থেকে চৌবাচ্চায় জল ভরা হ'ত। চৌবাচ্চাটিতে সম্ভবত স্নান ও সাঁতার দুই-ই হ'ত। চুল্লির চিহ্ন দেখে মনে হয়, হামাম বা বাষ্পস্নানের ব্যবস্থাও ছিল।

৩. খাদ্য—নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য—শিল্পদ্রব্য

খাদ্য ঃ ভূগর্ভে যেসব ভুক্তাবশেষ পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায়, এখানকার লোকে গম, যব, খেজুর, মাছ ও মাংস খেত। ধানের চিহ্ন পাওয়া

যায়নি। এখানে গোরু, মহিষ ও ভেড়ার কঙ্কাল ও হাড় পাওয়া গেছে। সম্ভবত এরা ভেড়ার মাংস ও গোরু-মহিষের দুধ খেত।

নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য : এখানে খুব উন্নত ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। তা ছাড়াও পাওয়া গেছে তামা, ব্রোঞ্জ, রুপা ও চীনামাটির সুন্দর সুন্দর বাসন। এখানে সুতী ও পশমী কাপড়ের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এখানকার লোকে তুলো ও পশমের কাপড় বুনত এবং সুতী ও পশমের পোশাক পরত। মহেন্‌জো-দড়োতে পাওয়া একটি বড় মূর্তি দেখে বোঝা যায়, এখানকার লোকে শালের মতো কারুকার্য-করা বহুমূল্য চাদর গায়ে দিত। হাতিদাঁতের সুচ, মাটি, চীনামাটি ও হাড়ের মাকু ও কাটিম পাওয়া গেছে। ঐগুলি নিশ্চয় বোনা ও সেলাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হত। এখানে নিত্যব্যবহার্য অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে আরো পাওয়া গেছে তামা ও ব্রোঞ্জের দা, ছুরি, কুড়ুল, ক্ষুর, ব্রোঞ্জের আয়না প্রভৃতি। টাঙি, বর্শা, ছোরা, খাটো তরবারি ও গদা প্রভৃতির মতো অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেছে। তীর-ধনুকের মতো কোন অস্ত্র ব্যবহৃত হ'ত বলেও মনে হয়।

একটি বর্ণবিচিত্র মৃৎপাত্র

অলংকার : মৃৎশিল্পের মতোই এখানকার লোকে অলংকারশিল্পেও খুবই উন্নত ছিল। এখানকার লোকে সোনা, রুপা, হাতিদাঁত, সুন্দর সুন্দর ঝিনুক ও দামী পাথরের গহনা পরত। গহনাগুলির মধ্যে বালা, হার, আংটি, দুল, তোড়া, নাকছাবি প্রভৃতি প্রধান। মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্পের মতোই এখানে ধাতু-শিল্পও খুবই উন্নত ছিল।

মূর্তি : খেলনা : এখানে বহু খেলনা, পুতুল এবং মূর্তিও পাওয়া গেছে। এখানে সম্ভবত পাথরের অভাব থাকার জন্যেই ঐগুলির অধিকাংশই মাটির তৈরি। তবে কিছু কিছু পাথরের মূর্তিও পাওয়া গেছে। মাটির খেলনাগুলি থেকে ঐ সময়ের সামাজিক অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মাটির তৈরি খেলনা-গোরুর গাড়ি ও চেয়ার দেখে বোঝা যায়, ঐ সময় গোরুর গাড়ি ও চেয়ার ব্যবহৃত হ'ত। নাচার ভঙ্গিতে তৈরি পুতুল দেখে জানা যায়, এখানকার

মেয়েরা নাচতে জানত, চুল ঘাড়ের ওপরে ফেলত। মহেন্‌জোদড়োয় পাওয়া বড় মূর্তি দেখে বোঝা যায়, লোকে দামী দামী আলোয়ান ব্যবহার করত। তারা দাড়ি রাখত, কিন্তু ঠোঁটের ওপরের চুল কামাতো।
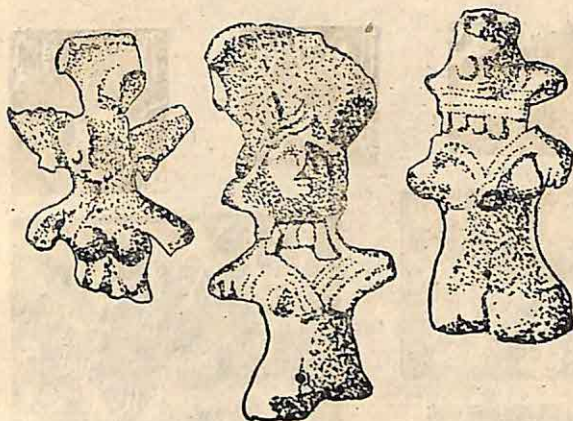
মহেন্‌জোদড়োয় আবিষ্কৃত খেলনা ও পুতুল

৪. শ্রমশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য

শ্রমশিল্প ঃ এখানে শ্রমশিল্প খুবই উন্নত ছিল। মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প ও ধাতুশিল্পই ছিল প্রধান। ধাতুশিল্পে উন্নতির ফলে এখানকার লোকে বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বও জেনেছিল। মহেন্‌জোদড়োতে সারিবদ্ধ ছোট ছোট বহু বাড়ির ধ্বংসাবশেষ বার হয়েছে। এগুলি শ্রমশিল্পীদের গৃহ, কারখানা বা দোকান ছিল মনে হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ সিন্ধু সভ্যতার যুগের মানুষ কৃষিকার্যে ও শ্রমশিল্পে খুবই উন্নত ছিল। তাই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। তখনও মুদ্রার প্রচলন ছিল না। তাই বিনিময়ের মাধ্যমেই কেনাবেচা চলত। এজন্যে শহরে যেমন দোকানপাট গ'ড়ে উঠেছিল এবং ছোটবড় দোকানদার থাকত, তেমনি বিদেশের সঙ্গে ব্যবসার জন্যে ছিল সওদাগরের দল। এখানে পাঁচ শ-রও বেশি সীলমোহর পাওয়া গেছে। এইসব সিলমোহর খুব সম্ভব ব্যবসার কাজেই ব্যবহৃত হ'ত। সীলমোহরগুলিতে দুর্বোধ্য অক্ষরে কীসব লেখা আছে। তা থেকে বোঝা যায়, সিন্ধুসভ্যতার মানুষ লেখাপড়া জানত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ রাখত। ঐরকম একই ধরনের সীলমোহর দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলেও পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায়, ঐসব অঞ্চলেও সিন্ধু অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য করত। আবার সুমেরীয় অঞ্চলের কিছু

শিল্প-সামগ্রী, প্রসাধন-দ্রব্য ও সীলমোহর সিন্ধু অঞ্চলে পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায়, ঐ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরাও সিন্ধু অঞ্চলে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

সিন্ধু অঞ্চলে আবিষ্কৃত সীলমোহর

সিন্ধু অঞ্চলে উট ও হাতির হাড় ও কঙ্কাল পাওয়া গেছে। উট ও হাতি নিশ্চয় পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। খেলনা গোরুর গাড়ি দেখে বোঝা যায়, গোরুর গাড়িও ব্যবহৃত হ'ত। সিন্ধু অঞ্চলে বহু নদ-নদী থাকায় এবং আরব সমুদ্র কাছে হওয়ায় লোকে নিশ্চয় নৌচালনাও জানত। নদীপথে ও সমুদ্রপথে সম্ভবত তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

৫. ধর্ম ও উপাসনা

মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় প্রচুর মন্দির ও দেবমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু সিন্ধু অঞ্চলে ঐরকম কোনও মন্দির ও দেবমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই এখানকার ধর্ম ও উপাসনা সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলা যায় না। তবে এরা যে দেব-উপাসনা করত, এমন অনুমান করার কারণ আছে। ছোট ছোট অনেক পুতুল বা মূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলিকে অনেকে গৃহদেবতার মূর্তি ব'লে মনে করেন। শিবলিঙ্গের আকারের অনেক পাথরের টুকরোও পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত একটি সীলমোহরে তিনমুখবিশিষ্ট পশুবেষ্টিত একটি যোগী-মূর্তি ক্ষোদিত আছে। ঐ মূর্তিটি আমাদের পঞ্চানন পশুপতি

যোগীন্দ্র শিবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই মনে হয়, এখানকার লোকে শিব-দুর্গার মতো কোনও দেবদেবীর পুজো করতে। এইসব দেবদেবীই পরবর্তীকালে পৌরাণিক শিব-দুর্গায় পরিণত হয়েছিলেন।
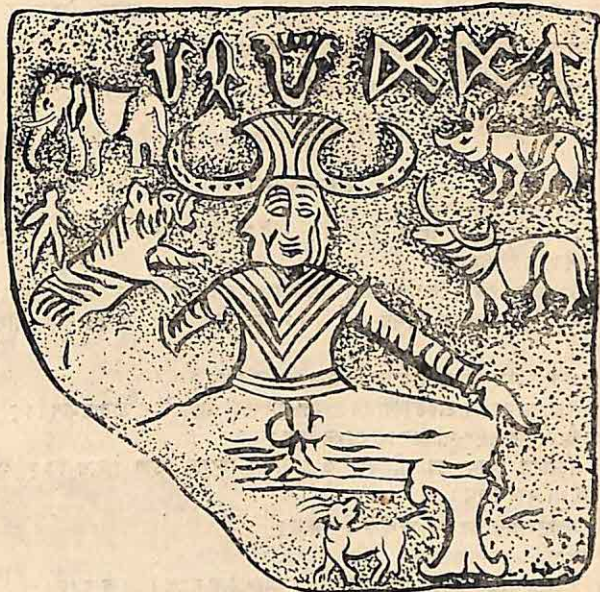
সীলমোহরে পশুপতি যোগীমূর্তি

এখানকার অনেক সীলমোহরে বট-অশ্বত্থ-জাতীয় বৃক্ষের পত্রাদি এবং বৃষ বা ঐজাতীয় প্রাণীর মূর্তি ক্ষোদিত আছে। তাই বট, অশ্বত্থ, গোজাতি প্রভৃতিকে এরা শ্রদ্ধা করত মনে হয়। সীলমোহরে পশুবেষ্টিত যোগীর যে মূর্তিটি আছে, তা দেখলে বোঝা যায়, এখানকার লোকে যোগাভ্যাসও করত।

৬. সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী

এখানে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সমস্ত বস্তু পাওয়া গেছে, তা থেকে এখানকার সমাজে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক বাস করত, তা অনুমান করা যায়। বিভিন্ন ধরনের গৃহ দেখে বোঝা যায়, সমাজে ধনী ও দরিদ্র ছিল, অভিজাত ও সাধারণ মানুষ ছিল। এখানে মেসোপটেমিয়ার মতো পুরোহিত-রাজা ও মিশরের মতো দেবতা-রাজা ছিল ব'লে মনে হয় না। তবে অভিজাত শ্রেণীর মানুষরা এখানে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করত মনে হয়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে কৃষিজীবীরাই ছিল প্রধান। তারপরেই স্থান ছিল কারিগর ও শ্রমশিল্পীদের। মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতির প্রাপ্ত নমুনা দেখে বোঝা যায়, এখানে কুমোর, তাঁতী, স্বর্ণকার, কাঁসারি, মণিকার প্রভৃতি শ্রেণীর

লোক বাস করত। গৃহ ও পথ নির্মাণের কাজে নিশ্চয় বহু দক্ষ স্থপতি ও শ্রমিক নিযুক্ত থাকত। জেলে ও কশাই ছিল। এক শ্রেণীর লোক সম্ভবত পশুপালনও করত। সীলমোহরের লিপিগুলি থেকে মনে হয়, এখানে শিক্ষিত লিপিকর শ্রেণীও ছিল। সম্ভবত সহজে বিনষ্ট হয়, এমন কিছুর ওপর লেখার ফলে ঐসব লেখা বিনষ্ট হয়ে গেছে, কেবল সীলমোহরের লেখাগুলিই পাওয়া গেছে।

সমাজে এক শ্রেণীর লোক ব্যবসা-বাণিজ্য ও দোকানদারি করত। পরিবহণ-ব্যবস্থাতেও নিশ্চয় অনেক লোক নিযুক্ত থাকত।

অনুশীলনী

১। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা বলতে কি বোঝ? এই সভ্যতার প্রাচীনতার প্রমাণ কি? এই সভ্যতা কোন্ যুগে বিকাশ লাভ করেছিল?

২। সিন্ধু উপত্যকায় প্রথমে কোথায় কোথায় খননকার্য চালানো হয়? মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পা কোথায় অবস্থিত? মহেন্‌জোদড়ো শব্দের অর্থ কি? মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কার কে কে করেছিলেন?

৩। সিন্ধু অঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় কি কি দ্রব্য পাওয়া গেছে?

৪। সিন্ধু সভ্যতার যুগের ভারতীয়রা যে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত ছিল তার প্রমাণ কি?

৫। মহেন্‌জোদড়োর শহর-পরিকল্পনা কেমন ছিল?

৬। সিন্ধু সভ্যতার লোক যে পরিচ্ছন্ন ও শৌখিন ছিলেন, তার প্রমাণ কি? মহেন্‌জোদড়োর স্নানাগার সম্পর্কে যা জান লিখ।

৭। সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলের ধর্ম সম্পর্কে কি জান?

৮। ঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও ঃ

(ক) সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নবপ্রস্তর যুগে / তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে / লৌহ যুগে।

(খ) সিন্ধু সভ্যতায় লোকে ব্যবসা করত গ্রীসের সঙ্গে / রোমের সঙ্গে / মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে।

(গ) মহেন্‌জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় / দয়ারাম সাহানি।

৯। ভুল অংশ কেটে দাও ঃ

(ক) সিন্ধু সভ্যতার লোকে লিখতে জানত / জানত না।

(খ) সিন্ধু সভ্যতার লোকে লোহার ব্যবহার জানত / জানত না।

(গ) সিন্ধু সভ্যতা ছিল গ্রামীণ সভ্যতা / নাগরিক সভ্যতা।

(ঘ) মহেন্‌জোদড়োয় মন্দির পাওয়া গেছে / যায়নি।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

মহেন্‌জোদড়োয় যে স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি লম্বায় —— ফুট ও চওড়ায় —— ফুট। এর চারদিকেই ছিল —— ফুট পুরু দেওয়াল। স্নানাগারের মধ্যে ছিল —— ফুট লম্বা, —— ফুট চওড়া, — ফুট গভীর একটি চৌবাচ্চা।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। মহেন্‌জোদড়ো শব্দের অর্থ কি?

২। মহেন্‌জোদড়ো কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত?

৩। হরপ্পা কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত?

৪। মহেন্‌জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ কে আবিষ্কার করেন?

৫। হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ কে আবিষ্কার করেন?

৬। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের সীলমোহরগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হ'ত ব'লে মনে হয়?

৭। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা কোন্ যুগে গ'ড়ে উঠেছিল—তাম্র যুগে না লৌহ যুগে?

চীনদেশের সুপ্রাচীন সভ্যতা

১. হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী অঞ্চল

চীনদেশের দুই প্রধান নদী—**হোয়াংহো** ও **ইয়াংসিকিয়াং**। উত্তর চীনের পূর্বাংশে হোয়াংহো বা পীত নদী প্রবাহিত। যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এই নদী প্রবাহিত, সেই অঞ্চলের মাটির রঙে এই নদীর জলের রঙ হলদে হওয়ায় নদীর নাম হয়েছে **পীত নদী**। হোয়াংহো নদীর দক্ষিণে ইয়াংসিকিয়াং নদী প্রবাহিত। এই নদীও হোয়াংহো নদীর মতো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

এই দুই নদীতে প্রবল বন্যা হওয়ায় এই দুই নদীর তীরবর্তী অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর। তাই এখানে সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল, সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

বন্যানিরোধ সম্পর্কে কাহিনী-কিংবদন্তীঃ কৃষিজীবী মানুষরাই এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। এই দুই নদীর তীরবর্তী অঞ্চল উর্বর হ'লেও এখানে বন্যার প্রকোপ ছিল অত্যধিক। মেসোপটেমিয়ার মতো এখানেও মানুষ বন্যানিরোধের জন্যে সংঘবদ্ধ চেষ্টা করেছিল।

বন্যার বিরুদ্ধে এখানকার মানুষকে যে কতো লড়াই করতে হয়েছিল, তা চীনদেশের প্রাচীন কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রতি বছর বানের জলে শত শত মাইলব্যাপী মানুষের বাসস্থান ও কৃষিক্ষেত্র ভেসে যেতো। বন্যার হাত থেকে যারা রক্ষা পেত, তারাও অনাহারে মরত। এই ভয়ানক বিপদের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তা-ই ছিল মানুষের চিন্তা। দেশের রাজা **কুন** নামে এক ব্যক্তির ওপর ভার দিলেন বন্যানিরোধের। কুন বানের জল আটকাবার জন্যে বড় বড় বাঁধ বাঁধলেন, প্রাচীর দিলেন। তাতে নদী যেন আরও ক্ষেপে গেল। ভয়ংকর বানের জলে বাঁধ, পাঁচিল সব ভেসে গেল। বন্যায় ডুবে গেল দেশ।

তখন এগিয়ে এলেন কুনের ছেলে **ইউ**। **তিনি** বান আটকাবার জন্যে বাঁধ বাঁধলেন সত্যি, সেই সঙ্গে নদীর বুক আরো গভীর ক'রে কাটালেন। অনেক খাল-নালাও করালেন, যাতে নদীর জল সহজে বার হয়ে যেতে পারে। এই কাজে তিনি আট বছর অক্লান্ত কাজ করলেন। তাঁর চেষ্টায় বানের হাত থেকে দেশ রক্ষা পেল। নদীর জলকে নূতন নূতন খাল-নালায় বইয়ে দেওয়ায় অনেক নতুন কৃষিক্ষেত্র তৈরী হ'ল। দেশ শস্য-সম্পদে ভরে উঠল। তাই চীনদেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে, "ইউ না থাকলে আমরা সবাই মাছ হয়ে যেতাম।"

২. সুপ্রাচীন চীনা সমাজ

চাষ-আবাদ ঃ চীন দেশে জোয়ার ও ধানের চাষ হ'ত। আর চাষ হ'ত সীম, শস্য ও লাউ-কুমড়ো জাতীয় সবজির। চাষ হ'ত তুঁতের। রেশমের কীট পালনের জন্যে তুঁতের পাতার খুব দরকার। চীনেরা খুব প্রাচীন কালেই রেশম আবিষ্কার করেছিল। তাই রেশম-কীট পালনের প্রয়োজনে তারা তুঁতের চাষ করত।

শিল্প ঃ চীনারা সুতী ও রেশমের কাপড় বুনত। প্রাচীন কাল থেকেই চীনা রেশম ছিল বিখ্যাত। তারা মৃৎশিল্পেও দক্ষ ছিল। খুব উন্নত ধরনের মৃত্তিকা এদেশে ছিল সুলভ। তা থেকেই সম্ভবত চীনামাটি কথাটি এসেছে। চীনারা ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত। তারা ব্রোঞ্জের বাসন-কোসনও তৈরি করত।

সমাজ-সভ্যতা ঃ এই অঞ্চলে পাথর দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং পোড়া ইঁটের প্রচলন না থাকায় ঘরবাড়িগুলি মাটি ও গাছের ডালপালা দিয়েই তৈরী হ'ত। চীনারা প্রচুর পরিমাণে শুয়োর পুষত। তারা সুপ্রাচীন কাল থেকেই ঘোড়ার ব্যবহার জানত।

কৃষিক্ষেত্রগুলি গ্রাম থেকে বেশ দূরে হওয়ায় কৃষকরা কৃষিক্ষেত্রগুলির কাছে ছোট ছোট কুঁড়ে বেঁধে থাকত। তারা মাঝে মাঝে বাড়ি আসত। তাই কৃষিকার্য ছাড়া অন্যান্য কাজ মেয়েদেরই করতে হ'ত। তুঁতের চাষও সাধারণত মেয়েরাই বাড়ির পাশে করত। রেশম-কীট পালন, রেশম উৎপাদন এবং রেশম থেকে সুতো ও কাপড় তৈরির কাজ ছিল মেয়েদের। মৃৎশিল্পও ছিল মেয়েদের কাজ। মেয়েরা রান্না ক'রে খাবার কৃষিক্ষেত্রে পেঁাছে দিয়ে আসত। গৃহের প্রকৃত কর্ত্রী ছিল স্ত্রীলোকরা। তারাই শস্য ও বীজ সঞ্চয় ক'রে রাখত, সংসারের দেখাশোনা করত।

চীনারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের খুবই শ্রদ্ধা করত। তাদের দেশের কাহিনী-কিংবদন্তীর নায়করা প্রায় সবাই জ্ঞানী-গুণী লোক। এইসব কিংবদন্তীর নায়ক **শেন নুং** নাকি তাদের আগুন, নিড়ানি ও লাঙলের ব্যবহার শিখিয়েছিলেন ; **হুয়াংতি** শিখিয়েছিলেন ধাতু ও নৌকোর ব্যবহার।

লিপি ঃ ঐ যুগে চীনারা লিপির ব্যবহারও আবিষ্কার করেছিল। সুমের ও মিশরের মতো প্রথমে ঐ লিপি ছিল চিত্রাক্ষর। ছবি দিয়েই জিনিস বোঝানো হ'ত। পরে ছবিগুলি রেখার টানে সাংকেতিক হয়ে ওঠে। কালি ও কলমের সাহায্যে সাধারণত বাঁশের পাতলা ছিলার ওপর লেখা হ'ত। লেখা হ'ত উপর থেকে নিচের দিকে। সুমের ও মিশরে প্রচলিত অক্ষরের পাঠোদ্ধার করতে হয়েছে পণ্ডিতদের প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে। কিন্তু চীনদেশে তেমনটি করতে হয়নি। এখানকার চীনা লিপির সঙ্গে প্রাচীন চীনা লিপির বেশ মিল আছে।

ধর্ম ঃ চীনারা মিশরীয় ও সুমেরীয়দের মতোই নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস করত। তবে বৃষ্টির ওপর তাদের সুখ-সম্পদ এবং দুঃখ-দুর্দশা নির্ভর করার

জন্যেই সম্ভবতঃ তারা আকাশকে প্রধান দেবতা ব'লে গণ্য করত, দেবতার কাছে তারা জীবজন্তু, এমন কি মানুষও বলি দিত। সুমেরের মতো এখানে রাজাই ছিলেন প্রধান-পুরোহিত। তিনিই দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতেন। প্রাচীন কালে চীনারা পূর্বপুরুষদেরও পুজো করত।

শ্রেণী-বৈষম্য : দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। সমাজে অভিজাত শ্রেণীর লোকদেরই সবচেয়ে বেশি প্রতাপ ছিল। রাজার কাজ অনেক সময়ে পুরোহিতের কাজেই সীমাবদ্ধ থাকত। অভিজাত শ্রেণীই দেশ শাসন করত।

অনশুীলনী

১। চীন দেশের প্রাচীন সভ্যতা কোন্ কোন্ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গ'ড়ে উঠেছিল ? এই নদীগুলি কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে প্রবাহিত ? হোয়াং হো নদীকে পীত নদী বলা হয় কেন ?

২। চীন দেশে প্রধানতঃ কিসের চাষ হ'ত ?

৩। চীন দেশে বন্যা নিরোধ সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীটি লেখ। Item - 5.

৪। "ইউ না থাকলে আমরা মাছ হয়ে যেতাম।"—এ কথা কারা বলত ? কেন বলত ?

৫। প্রাচীন চীনে রাজার প্রধান কাজ কি ছিল ?

৬। চীনাদের সামাজিক জীবন কিরূপ ছিল ?

৭। চীনা লিপি কিরূপ ছিল ? কিসের ওপর কি দিয়ে প্রধানত লেখা হ'ত ?

৮। চীনাদের ধর্ম সম্পর্কে কি জান ?

৯। ঠিক অংশের নিচে দাগ দাও :

(ক) চীনা সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয়েছিল তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে / লৌহ যুগে / নবপ্রস্তর যুগে।

(খ) চীনারা বিখ্যাত ছিল তুলোর জন্যে / পশমের জন্যে / রেশমের জন্যে।

(গ) প্রাচীন চীনারা ছিল প্রধানত পশুপালক / কৃষিজীবী / যাযাবর।

(ঘ) চীনা লিপি লেখা হয় ডান থেকে বাঁয়ে / বাঁ থেকে ডানে / উপর থেকে নীচে।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) চীনদেশের প্রধান পুরোহিত ছিলেন ——। (খ) চীনারা রেশম কীটের জন্যে —— চাষ করত। (গ) চীনারা —— পুজো করত। (ঘ) হোয়াং নদীর এক নাম হ'ল —— নদী।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন :

১। চীনারা আকাশের পুজো করত কেন ?

২। চীনদেশে প্রধান পুরোহিতের কাজ কে করতেন ?

৩। চীনারা তুঁতের চাষ করত কেন ?

৪। হোয়াং-হো নদীকে পীত নদী বলা হয় কেন ?

৫। কোন্ যুগে চীনারা সুসভ্য হয়ে উঠেছিল ?

৬। চীনা লিপি কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে লেখা হ'ত ?

৭। চীনা গল্প অনুসারে কে চীনে বন্যা-প্রতিরোধ করেছিলেন ?

৫

নদীমাতৃক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

১. স্বতন্ত্র সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে কৃষিজীবী মানুষকে উর্বর কৃষিক্ষেত্রের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হ'ত না। নদীতে বন্যার ফলে কৃষির জমি সর্বদাই উর্বর থাকত। তাই স্থায়ী বসতিগুলি গড়ে উঠেছিল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। স্থায়ী অধিবাসী হওয়ায় একটি বিশেষ স্থানের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দীর্ঘকাল ধরে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। ফলে এক-এক অঞ্চলে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে মানুষের খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতিতে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল। গোড়ার দিকে বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা পৃথক পৃথক বসতি স্থাপন করলেও দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে ক্রমেই তারা স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক-একটি জাতিতে পরিণত হয়েছিল। একই স্থানে দীর্ঘকাল বাস করায় তাদের সকলের ব্যবহারযোগ্য ভাষা বিকাশ লাভ করেছিল, স্বতন্ত্র লিপির উদ্ভব হয়েছিল। উপজাতিগুলি নিজ নিজ দেবদেবীর স্থলে জাতির সকলের উপাস্য কোন দেবতার প্রাধান্য মেনে নিয়েছিল এবং অন্যান্য দেবদেবীরাও সকলের উপাস্য হয়েছিল। এইভাবে এক-একটি অঞ্চলে এক-একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল।

২. সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এই সমস্ত সভ্যতা পৃথক পৃথক অঞ্চলে পৃথকভাবে গ'ড়ে উঠলেও এদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সভ্যতাগুলি তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে গ'ড়ে উঠেছিল। উন্নত ধরনের পাথরের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তখন ব্যবহৃত হ'লেও তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারই ব্যাপক ছিল। তবে এরা কেউই লোহার ব্যবহার জানত না।

এইসব সমাজ ছিল প্রধানত কৃষিজীবী। উদ্‌বৃত্ত শস্যসম্ভারই ছিল জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদই দেশের অন্যান্য শিল্প ও বৃত্তির মানুষের জীবিকা যোগাতো। উদ্‌বৃত্ত শিল্পসম্ভার বিদেশে বিক্রি হ'ত, আর বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে আসত। দেশে ও বিদেশে মুদ্রার প্রচলন ছিল না। তাই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বিনিময়ের মাধ্যমেই হ'ত।

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে নৌকো, ভেলা প্রভৃতি জলযান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হ'ত। ফলে এইসব অঞ্চলের লোক এই যুগেই নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। কেবল তারা দাঁড়ের ব্যবহারই করত না, পালের ব্যবহারও করত। বহুদাঁড়বিশিষ্ট

ও বহুপালবিশিষ্ট বড় বড় জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিত। স্থলে এই সময়ে পরিবহণে মালবাহী পশুর ব্যবহারই ছিল প্রধান। চাকার ব্যবহার সুপ্রচলিত হওয়ায় গোরুর গাড়ির মতো গাড়িও ব্যবহৃত হ'ত। চীন দেশের লোকে ঘোড়ার ব্যবহার জানলেও মেসোপটেমিয়া, মিশর ও সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা ঘোড়ার ব্যবহার জানত না। গোরু, গাধা, উট ও হাতী মালবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হ'ত।

কৃষিকার্যে এখন পশুবাহিত লাঙল ব্যবহৃত হচ্ছিল। পরিবহণে পশু খুবই আবশ্যক ছিল। মাংস ও দুধের জন্যেও গৃহপালিত পশুর প্রয়োজন ছিল। তাই কৃষির সঙ্গে পশুপালনও সমাজের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

দেশে যতোই সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটছিল, ততোই হিসেব-নিকেশ ও নানাবিধ বিবরণী রাখার প্রয়োজনও বেড়েছিল। তাই মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু অঞ্চল, চীন—সকল নদী-তীরবর্তী অঞ্চলেই লিপির উদ্ভব ঘটেছিল।

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি ও কৃষিক্ষেত্র গ'ড়ে তোলা দু-একটি পরিবারের দ্বারা সম্ভব ছিল না। বহু মানুষের সংঘবদ্ধ চেষ্টাতেই তা সম্ভব হয়েছিল। এই চেষ্টা চালাবার জন্যে সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালন-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। এই পরিচালন-ব্যবস্থায় যারা অধিকতর দক্ষতা, পরিচালন-শক্তি ও উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দিত, তারাই সমাজে প্রাধান্য পেত। তাদের পরামর্শ, আদেশ, নির্দেশ সকলে মেনে নিত। এইভাবে সমাজে একটি শাসক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এরাই পরে শক্তিশালী অভিজাত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল।

সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারাই বসতি ও কৃষিক্ষেত্রগুলি গড়ে উঠেছিল। উদ্বৃত্ত শস্যই ছিল অন্যান্য শিল্প ও বৃত্তির বিকাশের মূলে। তাই সকল মানুষের নিজ নিজ অধিকার যাতে রক্ষিত হয়, সকলেই যাতে নিজ নিজ প্রাপ্য, ন্যায় ও সুবিচার পায়, সেজন্যে আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। ফলে নদী-তীরবর্তী সভ্য অঞ্চলগুলিতেই প্রথম রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থার সূচনা ঘটেছিল।

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের সভ্য সমাজগুলি ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা কৃষির পক্ষে ছিল অনিষ্টকর। এইসব প্রাকৃতিক শক্তি ছিল যেমন মানুষের কাছে দুর্বোধ্য, তেমনি সেগুলি ছিল মানুষের আয়ত্তের বাইরে। মানুষ তাই এইসব অদৃশ্য শক্তিকে ভয় করত, তাকে প্রসন্ন রাখার জন্যে সর্বদা চেষ্টা করত। এইভাবে তারা দেবতার কল্পনা করেছিল এবং সেই দেবতাকে প্রসন্ন রাখার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। তারা দেশের সম্পদকে দেবতার দান মনে করত। দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তিকে দেবতার সম্পত্তি ব'লে ভাবত। তারা জাদুশক্তিতেও বিশ্বাস করত। এক শ্রেণীর মানুষ জাদুশক্তির অধিকারী ব'লে পরিচিত ছিল। তারাই দেবতাকে প্রসন্ন রাখতে পারে ব'লে

মানুষ মনে করত। এরাই সমাজে শক্তিশালী পুরোহিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে প্রধান দেবতার পুরোহিতই দেশের রাজা হয়ে উঠত।

বৎসরের একই সময়ে কৃষিকার্য আরম্ভ হ'ত। ফলে ঐ সময়টি আগে থেকে জানবার জন্যে দিন-গণনার প্রয়োজন ছিল। এইভাবে নদী-তীরবর্তী সভ্য অঞ্চলেই বর্ষগণনার সূত্রপাত হয়েছিল। কৃষিকার্য আরম্ভের সময় নিরূপণের জন্যে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রগুলিকে লক্ষ্য করা হ'ত। এইভাবে জ্যোতির্বিদ্যার সূচনা হয়েছিল।

ধাতুশিল্পের উন্নতির জন্যে প্রয়োজন ছিল উন্নত রসায়নবিদ্যার, হিসেব-নিকেশের জন্যে প্রয়োজন ছিল গণিতের, কৃষিক্ষেত্র বণ্টন, মন্দির নির্মাণ প্রভৃতির জন্যে জ্যামিতির প্রয়োজন ছিল। এইভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রেই নদীতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষরা আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

ব্যাপক মন্দির নির্মাণ, দেবমূর্তি নির্মাণ প্রভৃতির ফলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যও বিস্ময়কর বিকাশ লাভ করেছিল।

অনুশীলনী

১। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে স্বতন্ত্র জাতি ও সভ্যতা কেন গ'ড়ে উঠেছিল ?
২। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতা প্রধানতঃ কোন্ যুগে গ'ড়ে উঠেছিল ?
৩। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে প্রথম লিপির উদ্ভব ঘটেছিল কেন ?
৪। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে জ্যোতির্বিদ্যার সূচনা হয়েছিল কেন ?
৫। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলেই রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল কেন ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লৌহ যুগের জনসমাজ

১. লৌহ যুগের সূচনা

এতদিন লোকে সোনা, রূপা, টিন, তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত। হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও পাত্রাদির জন্যে ব্যবহার করত তামা ও ব্রোঞ্জ। কিন্তু তামা ও টিন সুলভ নয়, তাই সাধারণ মানুষ ঐগুলি ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারত না। এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটালো লোহার আবিষ্কার।

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেও মানুষ লোহার সঙ্গে পরিচিত ছিল। তবে তা ছিল উল্কা থেকে বা স্বাভাবিকভাবে পাওয়া লোহা। তাকে পিটিয়ে জিনিস তৈরি করা বেশ

কঠিন ছিল। লোহা কিভাবে গালাতে হয়, তা জানা ছিল না। তাই লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়নি।

মেসোপটেমিয়া ও মিশরে মানুষ যখন সভ্য হয়ে উঠেছিল, তখন মধ্য-ইউরোপ, পূর্ব-ইউরোপ ও মধ্য-এশিয়া থেকে পশুপালক যাযাবর জাতির লোকেরা ক্রমেই দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিল। এরা **আর্য** নামে পরিচিত। এই যাযাবর মানুষগুলির কিছু অংশ শেষে **আর্মেনিয়ার** পার্বত্য অঞ্চলে এসে বাস করেছিল। তারা লোহার সঙ্গে পরিচিত ছিল, লোহাকে কিভাবে গালানো যায়, আকরিক লোহপাথর থেকে কিভাবে লোহা বার করা যায়, তা আয়ত্ত করেছিল। তারাই লোহার প্রচলন শুরু করেছিল। আর্মেনিয়ার দক্ষিণে **মিতানি** নামে জাতির লোকেরা লৌহাস্ত্র ব্যবহার করে। মিতানিদের পরে **হিটাইট** নামে জাতির লোকেরা লৌহাস্ত্রের ব্যবহার ক'রে খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অন্যান্য ধাতুর তুলনায় লোহা সহজলভ্য ও সস্তা। তাই আকরিক লৌহ-প্রস্তর থেকে কিভাবে লোহা উৎপাদন করা যায় এবং কিভাবে তা গালিয়ে অস্ত্রাদি তৈরি করা যায়, তা যখন অন্যান্য জাতির লোকে জানতে পারল, তখন লোহার প্রচলন ব্যাপক হয়ে উঠল। লোহা দিয়ে কেবল লৌহাস্ত্র নয়, হাতিয়ার, কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও তৈরি হ'তে লাগল। তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার ক্রমেই কমে এল। শুরু হ'ল **লৌহ যুগ**।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছকাছি সময়ে—এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে—লৌহযুগ শুরু হয়েছিল।

২· লৌহের আবিষ্কার ও তার প্রতিক্রিয়া

তামা ও ব্রোঞ্জের চেয়ে লোহার দাম অনেক কম হওয়ায় লোহার হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এখন সকলের পক্ষে সহজলভ্য হয়ে উঠল। আগে কারিগররা সহজে তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে পারত না। সেজন্য তাদের রাজপ্রাসাদ, মন্দির বা অভিজাতদের গৃহস্থালির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হ'ত। এখন সে সহজেই নিজের যন্ত্রপাতি নিজে সংগ্রহ করতে পারল এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেল। লোহার যন্ত্রপাতি তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির চেয়ে অনেক বেশী উপযোগী হওয়ায় কৃষি ও শিল্পকর্মে দ্রুত উন্নতি ঘটল।

তামা ও ব্রোঞ্জের যুদ্ধাস্ত্রগুলি ছিল মূল্যবান্। তাই তা সাধারণ মানুষ সহজে সংগ্রহ করতে পারত না। ঐসব অস্ত্রের জন্যে রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মুখাপেক্ষী হ'তে হ'ত। কিন্তু এখন যে-কেউ স্বল্প ব্যয়ে লোহার যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করতে পারল এবং সৈনিক বা যোদ্ধা হয়ে উঠল। দেশে বড় বড় সৈন্যদল গঠনও সহজ হ'ল।

এইভাবে লৌহের প্রচলন সাধারণ মানুষকে নানাদিক থেকেই স্বাধীন ও শক্তিশালী ক'রে তুলল।

লৌহের প্রচলন রাজশক্তিও বৃদ্ধি করল। তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র দামী হওয়ায় ঐ অস্ত্র খুব বেশি সংখ্যক সৈন্যকে দেওয়া যেত না। তাই সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো খুবই ব্যয়বহুল ছিল। লৌহাস্ত্র সহজলভ্য ও সস্তা হওয়ায় এখন লৌহাস্ত্রে সজ্জিত বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হ'ল। বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনীর অধিকারী হওয়ায় রাজারা পূর্বের তুলনায় এখন আরও পরাক্রান্ত হয়ে উঠলেন। এইসব বিরাট বাহিনী কেবল স্বদেশেই রাজশক্তিকে সুদৃঢ় করল না; দেশের পর দেশ জয় ক'রে সাম্রাজ্য স্থাপন করল। অনেক রাজাই এখন সম্রাট হলেন, রাজ্য হ'ল সাম্রাজ্য।

অনুশীলনী

১। লৌহ যুগ বলতে কি বোঝ? কিভাবে ঐ যুগের প্রবর্তন হয়েছিল? এখন থেকে লৌহ যুগের সূচনা কতদিন আগে হয়েছিল?

২। কোথাকার লোকে লৌহের ব্যবহার প্রথম আয়ত্ত করেছিল? তারা কোন্ জাতির লোক ছিল? কোন্ কোন্ জাতির লোকে প্রথম লৌহাস্ত্র ব্যবহার করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল?

৩। লোহার ব্যবহার ব্যাপক হওয়ার কারণ কি?

৪। লৌহ যুগে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা কেন বৃদ্ধি পেয়েছিল?

৫। লৌহ যুগে রাজশক্তি বেড়েছিল কেন?

৬। ঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও:

(ক) লৌহ যুগের সূচনা হয়েছিল এখন থেকে সাড়ে তিন হাজার / চার হাজার / পাঁচ হাজার বছর আগে।

(খ) লৌহের ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল মিশরীরা / সুমেরীয়রা / আর্যরা।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

১। কোন্ জাতির লোকে প্রথম লৌহের ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল?

২। কখন থেকে লৌহ যুগ প্রবর্তিত হয়েছিল?

১

বেবিলনের অভ্যুত্থান—হামুরাবি—হামুরাবির আইন-সংহিতা

১. বেবিলন—কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য

বেবিলনিয়া ঃ মেসোপটেমিয়ায় **ইউফ্রেতিস** নদীর তীরে সুমেরের উত্তরে **বেবিলন** অবস্থিত। সেখানে একটি উপজাতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই উপজাতি **আমোরাইট** নামে পরিচিত। এরাও আক্কাদীয়দের মতো ছিল সেমিটিক জাতির লোক। এই উপজাতির রাজা **হাম্মুরাবি** একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গ'ড়ে তোলেন। এখন বেবিলন সুমেরের স্থান অধিকার করে। হাম্মুরাবির সাম্রাজ্য সমগ্র মেসোপটেমিয়ায় বিস্তৃত হয়। মেসোপটেমিয়ার পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চলও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সাম্রাজ্যের নাম **বেবিলনিয়া**।

পশুপালন ও কৃষি ঃ হাম্মুরাবির পূর্বপুরুষরা ছিলেন পশুপালক যাযাবর। তাই হাম্মুরাবি কৃষিকার্যের সঙ্গে পশুপালনের উপরও জোর দেন। তিনি প্রকাণ্ড একটি খাল খনন করেন এবং সারা দেশে সেচব্যবস্থার উন্নতি করেন। তিনি দেশে ভেড়া, ছাগল, গোরু ও উট পালনের ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। পশুপালনের সঙ্গে দেশে ব্যাপক পক্ষী-পালনেরও ব্যবস্থা করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে গম ও যবের সঙ্গে রসুন, পেঁয়াজ, সীম, শাক, মূলা, গাজর, এলাচ, জাফরান প্রভৃতির চাষেরও ব্যবস্থা হয়। খেজুরের চাষ আরো ব্যাপক করা হয়।

শ্রমশিল্প ও বাণিজ্য ঃ শ্রমশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের খুবই উন্নতি হয়। ষাঁড়, গাধা ও উট মালবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হ'লেও স্থলপথ সিংহ, বন্য শূকর প্রভৃতির জন্যে নিরাপদ ছিল না। জলপথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল এবং জলযানগুলি যথেষ্ট দ্রুতগামী হয়ে উঠেছিল। তাই নৌবাণিজ্যে বেবিলন খুব উন্নত ছিল।

দেশের মন্দিরগুলি ছিল ব্যবসায়-কেন্দ্র। ঐগুলি কতকটা ব্যাংকের মতো কাজও করত। তখন মুদ্রার প্রচলন না হ'লেও নিয়মিত আকারের রৌপ্যপিণ্ড ও স্বর্ণপিণ্ড ওজন অনুসারে কতকটা মুদ্রার কাজ করত। সোনার দাম ছিল রূপোর দামের পনের গুণ। যাতে সোনা বা রূপো খাঁটি হয়, সেজন্যে অনেক সময় স্বর্ণপিণ্ড ও রৌপ্যপিণ্ডের ওপর সরকারী ছাপ দিয়ে দেওয়া হ'ত।

২. মন্দির ও পুরোহিত—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

মন্দিরের গুরুত্ব ঃ সামাজিক জীবনে মন্দিরের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। সুমেরীয় ও আক্কাদীয়দের সময়ে প্রধান দেবতা ছিলেন **এনলিল**। এখন প্রধান দেবতা ছিলেন

বেল্‌মার্দুক (সূর্য)। এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক দেবতা ছিলেন। দেবতাদের বহু মন্দির ছিল বেবিলনে। মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল সর্বপ্রধান দেবতা বেল্‌-মার্দুকের মন্দির। মন্দিরগুলির পুরোহিতরা বিপুল মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মন্দিরে পুরোহিতদের সঙ্গে মহিলা-পুরোহিতও থাকতেন। প্রধানা মহিলা-পুরোহিতের খুব সম্মান ছিল। রাজকুমারীরাই ঐ পদ পেতেন। তাঁকেই দেবতার প্রধান বধূ ব'লে গণ্য করা হ'ত। মন্দিরে বহু দেবদাসী থাকত। রাজকর মন্দিরেই জমা দিতে হ'ত। কর বস্তুতেই দেওয়া হ'ত। তাই মন্দিরের পাশে বড় বড় শস্যভাণ্ডার ও পশুশালা থাকত। ঐসব ভাণ্ডার ও পশুশালার তত্ত্বাবধানের জন্যে বহু কর্মচারী নিযুক্ত থাকত। হিসেব-নিকেশ ও বিবরণ রাখার জন্যেও বহু লিপিকর থাকত। মন্দিরগুলি বিদ্যালয়েরও কাজ করত। এখানে শিশুরা সুমেরীয় লিপিগুলি আয়ত্ত করত।

বেবিলন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলাশিল্পের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় বেবিলন খুবই উন্নত ছিল। এ যুগে সুমেরীয় লিপির আরো উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু এই অঞ্চলে পাথরের অভাব থাকায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের তেমনি উন্নতি হয়নি।

৩. হামুরাবির আইন-সংহিতা

প্রাচীনতম আইন-সংহিতা ঃ হামুরাবি কেবল বিশাল সাম্রাজ্যই স্থাপন করেননি, তিনি তাঁর সুশাসনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই আইন প্রচলনের জন্যে একটি আইন-সংহিতা রচনা করেন। এটি **হামুরাবির আইন-সংহিতা** নামে খ্যাত। এটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম আইন-সংহিতা। হামুরাবি এই আইনগুলি একটি প্রস্তরফলকে খোদাই ক'রে বেল-মার্দুকের মন্দিরের স্তম্ভে লাগিয়ে দেন। ঐ প্রস্তর-ফলকের ওপরে একটি চিত্র খোদাই করা ছিল। তাতে দেখানো হয়েছে—বেল্‌-মার্দুক তাঁকে ঐ অনুশাসনলিপিটি দিচ্ছেন।

রাজা হামুরাবি

হামুরাবির আইন-সংহিতা চার ভাগে বিভক্ত—নাগরিক-বিধি, দণ্ডবিধি, বিচার-বিধি ও বাণিজ্য-বিধি। নাগরিক-বিধিতে তিনপ্রকার নাগরিকের উল্লেখ আছে—স্বাধীন নাগরিক, অর্ধ-স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাস। এতে এক-বিবাহ এবং সন্তানের ওপর পিতার পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এতে প্রত্যেক ভূস্বামীকে নিজ নিজ জমিদারিতে খাল খননের ও সেগুলি

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিচারবিধিতে বিচারক-নিয়োগের ও সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। দণ্ডবিধিতে বিভিন্ন অপরাধের বিভিন্নরূপ দণ্ডের কথা আছে। দণ্ডবিধি যথেষ্ট কঠোর ছিল; (এতে 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' নীতিই গৃহীত হয়েছিল। যেমন, কোন গৃহস্থের ছেলে যদি বাড়ি চাপা প'ড়ে মারা যায়, তবে ঐ বাড়ির মিস্ত্রির ছেলের প্রাণদণ্ড হবে।) বাণিজ্য-বিধিতে জিনিসপত্রের দর, মজুরি এবং ঋণের সুদের হার প্রভৃতি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

হামুরাবির পরেও বেবিলনীয় সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। পরে উত্তর-পশ্চিম থেকে হিটাইট, কাসাইট প্রভৃতি আর্য জাতির আক্রমণে তা হীনবল হয়ে পড়ে।

আসিরীয় ও কালডীয় জাতিঃ পরে তাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আসিরীয় জাতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্য স্থাপন করে। খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে বেবিলন আসিরীয় সাম্রাজ্যের অধীন হয়। পরে বেবিলন **কালডীয়** জাতির অধীনে পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কালডীয় রাজারা বেবিলনের অনেক শ্রীবৃদ্ধি করেন। ঐসময়ে প্রাসাদে, মন্দিরে, উদ্যানে বেবিলন আবার সুসজ্জিত হয়। কালডীয় রাজা **নেবুকাডনেজার** তাঁর প্রাসাদ-শীর্ষে যে অপরূপ উদ্যান রচনা করেন, তা আজও বেবিলনের শূন্যোদ্যান নামে খ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার পূর্বদিকে পরাক্রান্ত পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের ফলে অবশেষে বেবিলনের পতন ঘটে।

অনুশীলনী

১। বেবিলন কোথায় অবস্থিত? বেবিলনিয়া বলতে কি বোঝ? বেবিলনে কোন্ জাতির লোক প্রথম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল? তখন ঐ জাতির রাজা কে ছিলেন?

২। রাজা হামুরাবি সম্বন্ধে কি জান?

৩। বেবিলনে মন্দিরের গুরুত্ব কিরূপ ছিল?

৪। হামুরাবির আইন-সংহিতা সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

বেবিলন — নদীর তীরে সুমেরের — অবস্থিত ছিল। বেবিলনীয়দের প্রধান দেবতা ছিলেন —। এই দেবতার মন্দিরে রাজা — ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর —। হামুরাবির আইন-সংহিতা — ভাগে বিভক্ত। ঐ চার ভাগ হ'ল —, —, — ও —। এই আইন-সংহিতা পৃথিবীর — আইন-সংহিতা।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। বেবিলনিয়া কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

২। হামুরাবি কোন্ জাতির লোক ছিলেন?

৩। হামুরাবির যুগে বেবিলনিয়ার প্রধান দেবতা কে ছিলেন?

৪। পৃথিবীর প্রাচীনতম আইন-সংহিতা কোন্‌টি?

৫। শূন্যোদ্যান কি? কোথায় অবস্থিত ছিল?

৬। বেবিলনের শূন্যোদ্যান কার কীর্তি?

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে মিশর

১. মিশরীয় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশসমূহ

হিক্‌সস্‌-আক্রমণ ঃ পূর্বেই মিশরের সভ্যতা-সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উত্তর দিক থেকে দুর্ধর্ষ যাযাবর পশুপালক উপজাতিগুলির লোকেরা দক্ষিণে অগ্রসর হ'তে থাকে। এইরূপ একটি উপজাতি মিশরে প্রবেশ করে। এই উপজাতি লৌহাস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং দ্রুতগামী অশ্বের ব্যবহার জানত। ফলে এরা অতিশয় শক্তিশালী ছিল। এদের আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি মিশরের ছিল না। মিশর এই উপজাতির পদানত হয়। মিশরীরা এদের **হিক্‌সস্‌** বা মেষপালক রাজা বলত।

সম্রাট থুতমিস ঃ হিক্‌সস্‌রা মিশরে প্রায় দু শ বছর রাজত্ব করেছিল। কিন্তু এই বিদেশী শাসন মিশরীরা সহজে মেনে নেয় না। মিশরীরা নিজেরাও লৌহাস্ত্র ও অশ্বের ব্যবহার শেখে এবং শেষ পর্যন্ত এই বিদেশী শাসকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে। মিশর কেবল স্বাধীন হয় না, লৌহাস্ত্র, অশ্ব ও অশ্বচালিত রথের ব্যবহার শিখে নব বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ-বংশীয় ফারাও **তৃতীয় থুতমিস** এক দুর্জয় সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে মিশর নৌশক্তিতেও বলীয়ান হয়। তাঁর কীর্তিকাহিনী কারনাকের বিখ্যাত মন্দিরের গায়ে ক্ষোদিত আছে। তিনি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ফিনিসিয়া জয় করেন। সাইপ্রাস, ক্রীট প্রভৃতি ঈজিয়ান ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। তিনি দক্ষিণে নিউবিয়া পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তার করেন। এইভাবে এক বিশাল মিশরীয় সাম্রাজ্য গ'ড়ে ওঠে। তাই ফারাও তৃতীয় থুতমিসকে **মিশরের নেপোলিয়ন** বলা হয়।

তৃতীয় থুতমিস

তৃতীয় থুতমিস যেসব রাজ্য জয় করেন, সেগুলিকে তিনি নিয়মিত রাজকর দিতে বাধ্য করেন। পদানত দেশগুলিতে তিনি বিশ্বস্ত শাসনকর্তা নিয়োগ করেন, ঐসব দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে মিশরীয় সেনাপতির অধীনে মিশরীয় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখেন। অধীন রাজ্যগুলির শাসনকর্তাদের পুত্রদের মিশরে এনে মিশরীয় রীতিনীতি ও আদব-কায়দায় শিক্ষিত ক'রে তোলেন। শাসনকর্তাদের মৃত্যু হ'লে

তারা পিতার স্থলে শাসনকর্তা নিযুক্ত হ'ত এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মিশরীয় হওয়ায় মিশরের প্রতি অনুগত থাকত।

২. পুরোহিতদের ক্ষমতা

পুরোহিতদের মর্যাদার কারণ ঃ মিশরে পুরোহিতরা বিপুল মর্যাদা পেতেন। ফারাও দেবতা ব'লে গণ্য হ'লেও দেবদেবীর প্রতি মিশরীদের ছিল অচলা ভক্তি। মিশরীরা বিশ্বাস করত, পুরোহিতদের মধ্য দিয়েই দেবতা তাঁর বাসনা ব্যক্ত করেন, পুরোহিতরাই দৈববাণী জানান। ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দশায় মানুষ দেবতার করুণার প্রত্যাশা নিয়ে পুরোহিতদের কাছেই ছুটত। তাছাড়া পুরোহিতরা ছিলেন সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। ফারাওরাও তাঁদের পরামর্শ মেনে চলতেন, দেবতার মন্দিরের জন্যে অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। তাই মিশরে পুরোহিতদের ক্ষমতা ছিল অসামান্য।

ফারাও আখ্‌নাতন ও পুরোহিত শ্রেণী ঃ মিশরে পুরোহিতদের ক্ষমতা যে কত ছিল, তার প্রমাণ ফারাও চতুর্থ **আমেন্‌হোটেপ** বা **আখ্‌নাতনের** জীবন। মিশরে **আমন-রা** সূর্যদেবতারূপে পূজিত হতেন। তাঁর মূর্তি পুজো করা হ'ত। তিনি ছিলেন কেবলমাত্র মিশরের দেবতা। আমেন্‌হোটেপ ফারাও হয়ে সূর্যের উপাসনায় পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি বললেন, সূর্য কেবল মিশরের দেবতা নন, তিনি সকল বিশ্বের মঙ্গলদাতা ও পরিত্রাতা দেবতা। তিনি কেবল মূর্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নন, তাঁর প্রকাশ বিপুল বিশ্বে। চতুর্থ আমেন্‌হোটেপ সূর্যদেবতা আমন-রার মূর্তিপুজো নিষিদ্ধ ক'রে আতন বা সূর্যের পুজো চালু করলেন। সূর্যের প্রতীকরূপে ব্যবহার করলেন একটি থালার মতো চক্র এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির রেখাবলী। তাঁর নিজের নামের সঙ্গে আমন শব্দ (আমেন-হোটেপ) যুক্ত থাকায় তিনি নিজের নাম পরিবর্তন ক'রে নতুন নাম নিলেন—**আখ্‌নাতন** বা 'সূর্যের গৌরব'। তিনি আমন-রা সহ সমস্ত দেবদেবীর পুজো দেশে নিষিদ্ধ করলেন। প্রাসাদে, মন্দিরে, স্মৃতিসৌধে যেখানে আমন দেবতার নাম ছিল, তা তুলে দিলেন। তিনি নিজেকেও দেবতা ব'লে স্বীকার করলেন না। পুরোহিতদের ক্ষমতাচ্যুত করলেন।

এর ফলে শক্তিশালী পুরোহিত শ্রেণী ক্রুদ্ধ হ'ল। এক ঈশ্বরের কথা পৃথিবীতে এর আগে আর কেউ বলেননি। আখ্‌নাতনের চিন্তা ছিল যুগান্তকারী। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারল না।

এই দৃঢ়চেতা ফারাওয়ের অকালমৃত্যু হ'লে পুরোহিত শ্রেণী আবার নিজেদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। দেশে আমন-রা সহ সকল দেবদেবীর পুজো পুনরায় চালু হ'ল। সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

মিশর কিছুদিনের মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলি তার হস্তচ্যুত হয়।

অনুশীলনী

১। 'মেষপালক রাজা' কোন্ জাতির লোককে বলা হত? এদের সম্পর্কে কি জান? এরা কোন্ দেশে রাজত্ব করেছিল? এদের রাজত্ব কতদিন স্থায়ী হয়েছিল? এরা কিভাবে বিতাড়িত হয়েছিল?

২। প্রথম মিশরীয় সাম্রাজ্য কে স্থাপন করেছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। মিশরে পুরোহিত শ্রেণীর মর্যাদা কেন এত বেশি ছিল? কোন্ ফারাওয়ের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বেধেছিল? কেন?

৪। ফারাও আখনাতন সম্পর্কে কি জান?

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) চতুর্থ আমেনহোটেপ তাঁর নাম পরিবর্তন ক'রে নাম নেন ——।

(খ) আখনাতন শব্দের অর্থ "—— ——"।

(গ) ফারাও —— কে মিশরের নেপোলিয়ন বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। মেষপালক রাজা কাদের বলা হ'ত?

২। হিক্‌সস্‌রা কোন্ জাতির লোক ছিল?

৩। হিক্‌সস্‌রা এত শক্তিশালী ছিল কেন?

৪। হিক্‌সস্‌রা মিশরে কতদিন রাজত্ব করেছিল?

৫। মিশরের নেপোলিয়ন বলা হয় কাকে?

৬। আখনাতন শব্দের অর্থ কি?

৩

ইরান বা পারস্য

১. ইরান বা পারস্যের অভ্যুত্থান

আর্য জাতি ঃ মধ্য-এশিয়া থেকে একটি যাযাবর জাতির কয়েকটি শাখা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এরা ছিল গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়; এদের নাক ছিল উঁচু। এরা নিজেদের বলত **আর্য** বা **শ্রেষ্ঠ**। এরা লৌহ ও অশ্বের ব্যবহার জানত।

মিডি ও পারসিক ঃ আর্য জাতির লোকেরা দক্ষিণে এগোতে থাকে। তাদের একটি দল ভারতে প্রবেশ করেছিল। অন্য একটি দল আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মেসোপটেমিয়ার পূর্বে বসতি স্থাপন করে। এদের একটি উপজাতি মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত ধরে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। এই উপজাতির নাম **ইরানী** বা **পারসিক**। এদের উত্তরে ঐ দলের আর একটি উপজাতি মেসোপটেমিয়ার পূর্বে ও উত্তরে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের নাম **মিডি**।

মিডি ও পারসিক দুই উপজাতির সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। উভয়েই আর্য; উভয়েরই ধর্ম ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতি এক। তবে মিডিরাই ছিল **অধিকতর শক্তিশালী**।

তারা আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। রাজ্যের নাম ছিল **মিডিয়া**।

মিডিয়া ক্রমেই অধিকার বিস্তার করে। পারসিকদের বাসস্থানও তাদের অধিকারে যায়। উত্তরে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এইভাবে উত্তর-পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর থেকে দক্ষিণে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত মিডি-সাম্রাজ্য গ'ড়ে ওঠে।

সাইরাস ঃ কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারসিকরা **সাইরাসের** নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সাইরাস ছিলেন মিডি-সম্রাটের দৌহিত্র। সাইরাস তাঁর মাতামহকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে মিডি সাম্রাজ্য অধিকার করেন।

এশিয়া মাইনরের পূর্বে **লিডিয়া** নামে একটি রাজ্য ছিল। লিডিয়া ধন-সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। লিডিয়ার রাজাই পৃথিবীতে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন ব'লে কথিত আছে। তিনি সাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সাইরাস তাঁকে পরাজিত করেন। লিডিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন হয়। সাইরাস বেবিলনের শেষ কাল্ডীয় সম্রাটকে পরাজিত ক'রে বেবিলন অধিকার করেন। এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাজ্যগুলি তাঁর পদানত হয়। তিনি উত্তরে আফগানিস্থান পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। এইভাবে এক বিশাল পারসিক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় **সুসা**।

সাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **কাম্বিসিস** রাজা হন। তিনি মিশর জয় করেন। কাম্বিসিস্ শত্রুহস্তে নিহত হ'লে সাইরাসের মন্ত্রিপুত্র ও কাম্বিসিসের জ্ঞাতিভাই **প্রথম দরায়ুস** সম্রাট হন।

দরায়ুস ঃ দরায়ুস এই বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তিনি ভারতের গান্ধার ও সিন্ধু-তীরবর্তী অঞ্চলও সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই অঞ্চল থেকে নাকি পারস্য সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব আদায় হ'ত।

পারস্য-সম্রাট দরায়ুস

দয়ায়ুস পারস্য সাম্রাজ্যকে বিশটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তিনি নিজেকে মিশর ও বেবিলনের রাজা ব'লে ঘোষণা করেন। অন্যান্য প্রদেশের শাসনের জন্যে তিনি শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এইসব শাসনকর্তা **সত্রপ** (ক্ষত্রপ) নামে পরিচিত ছিলেন। প্রদেশকে বলা হ'ত সত্রাপি। দরায়ুস দেশে মুদ্রার প্রচলন করেন। ফলে এই বিশাল সাম্রাজ্যে ব্যবসা-

বাণিজ্যের খুবই উন্নতি হয়। দরায়ুস সারা সাম্রাজ্যে বড় বড় রাজপথ নির্মাণ করেন। সুসা পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী হ'লেও **পার্সেপলিস, পাসারগাডে, বেবিলন** প্রভৃতি বড় বড় নগর ছিল দেশে। বড় বড় রাজপথ ঐসব শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম দেশে ডাক-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ফারাওরা খাল কেটে লোহিত সাগরের সঙ্গে নীল নদকে যুক্ত করেছিলেন। পরে সংস্কারের অভাবে ঐ খাল বুজে গিয়েছিল। দরায়ুস আবার তা খনন করান। ফলে পারসিক নৌবহর লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পাড়ি দিত।

পারসিকরা প্রায় পঁচিশ বছরের মধ্যেই এই সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এত বড় সাম্রাজ্য এর আগে পৃথিবীতে স্থাপিত হয়নি।

দরায়ুস ও তাঁর পুত্র জেরেক্‌সিসের সঙ্গে গ্রীকদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। সে কাহিনী পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে।

২. জরথুস্ত্র ও পারসিকদের ধর্ম

মিডি ও পারসিকরা একই ধর্মে বিশ্বাস করত। এই ধর্মের প্রবর্তন করেন **জরথুস্ত্র**। এই ধর্মে অগ্নির উপাসনা করা হ'ত। তাই মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতরা অহোরাত্র আগুন জেবলে রাখতেন। এই ধর্মমতে বলা হয় যে, পৃথিবীতে সর্বদা সৎ ও আলোকের সঙ্গে যথাক্রমে অসৎ ও অন্ধকারের দ্বন্দ্ব চলছে। সৎ ও আলোকের দেবতা হলেন **মাজ্‌দা** বা **আহুরমাজ্‌দা**। আর অসৎ ও অন্ধকারের অপদেবতা হলেন **আহ্‌রিমন**। মাজ্‌দার অনেক দেবদূত আছেন। তাঁর প্রধান দেবদূত হলেন আলোক-দেবতা **মিথ্‌রা**। আহ্‌রিমনেরও অনেক অনুচর আছে।

জরথুস্ত্র মানুষকে সর্বদা সৎ ও আলোকের পক্ষে এবং অসৎ ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে থাকতে বললেন। যখন মানুষের শেষ বিচারের দিন আসবে, তখন মানুষ পরলোকে তার সৎকর্মের জন্যে পুরস্কৃত এবং অসৎকর্মের জন্যে দণ্ডিত হবে।

জরথুস্ত্রের মৃত্যুর পর তাঁর ভক্তরা তাঁর বাণীকে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ঐ গ্রন্থের নাম **আবেস্তা** বা **জেন্দাবেস্তা**। আবেস্তাই পারসিকদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

মিডি ও পারসিকরা আর্য ছিলেন। তাই ভারতীয় আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বেদের সঙ্গে আবেস্তার ভাব ও ভাষার অনেক মিল আছে।

জরথুস্ত্রের ধর্ম প্রায় দেড় হাজার বছর পারস্যে প্রচলিত ছিল। পরে মুসলমানরা পারস্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করলে নিজ ধর্ম রক্ষার জন্যে বহু পারসিক ভারতে পালিয়ে আসেন। এঁরাই এখন ভারতে **পার্শী** নামে পরিচিত।

অনুশীলনী

১। মিডি ও পারসিকরা কোন্ জাতির লোক ছিল? তারা কোথা থেকে কোন্ পথে এসে কোন্ কোন্ স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল?

২। মিডিয়া বলতে কি বোঝ? এই রাজ্য কিভাবে স্থাপিত হয়েছিল? মিডিয়া রাজের অধিকার কতদূর বিস্তৃত ছিল? মিডিয়ার পতন ঘটল কিভাবে?

৩। সাইরাস সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। দরায়ুসের সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। পারসিকদের ধর্ম সম্পর্কে কি জান? ভারতে তাদের পার্শী বলা হয় কেন?

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর:

পারসিকদের ধর্ম প্রবর্তন করেন ——। তাঁর মতে, মঙ্গল ও আলোকের দেবতা হলেন ——। অমঙ্গল ও অন্ধকারের অপদেবতা হলেন ——। পারসিকদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম ——।

৭। ঠিক উক্তির নিচে দাগ দাও:

(ক) দরায়ুস ছিলেন সাইরাসের পৌত্র/সাইরাসের মন্ত্রিপুত্র।

(খ) পারসিকরা ছিল সেমিটিক/আমোরাইট/আর্য।

(গ) পারসিকরা লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানত/জানত না।

(ঘ) পারস্যে ডাক-ব্যবস্থা প্রচলন করেন দরায়ুস/সাইরাস।

(ঙ) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রচলিত হয় লিডিয়ায় / পারস্যে / মিশরে।

(চ) মিশর জয় করেছিলেন দরায়ুস/সাইরাসাকাম/বিসিস।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

১। পারসিকরা কোন্ জাতির লোক ছিল?

২। পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন কে?

৩। কোন্ পারস্য সম্রাট ভারতের কিছু অংশ জয় করেছিলেন?

৪। কোন্ রাজ্যের রাজা সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রচলিত করেন?

৫। পারসিকদের ধর্মগুরু কে ছিলেন?

৬। প্রাচীন পারসিকদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

৭। আহুরমাজদা কে?

৮। দরায়ুস সাইরাসের কে ছিলেন?

৯। মিডিয়ার রাজা সাইরাসের কে ছিলেন?

১০। প্রাচীন পারস্যের রাজধানী কি ছিল?

১১। প্রাচীন পারস্যে কি কি বড় শহর ছিল?

১২। মুসলমান আক্রমণের সময়ে ধর্ম হারাবার ভয়ে যেসব পারসিক ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন, তাদের কি বলা হয়?
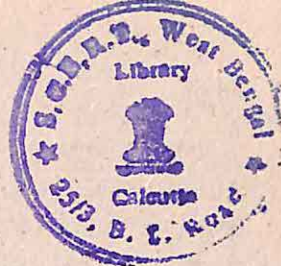
ইহুদী জাতির কথা

১. ইহুদী জাতি—মিশরে বন্দিদশা—

বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ

ইহুদী জাতি ঃ মেসোপটেমিয়া ও মিশরের কৃষিজীবী সমাজ যখন সমুন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তখন মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে এবং পার্শ্ববর্তী আরব অঞ্চলে এক পশুপালক উপজাতি বাস করত। এরা **হিব্রু** বা **ইহুদী** নামে পরিচিত। এরা আরব জাতির মতোই **আব্রাহামকে** এদের পূর্বপুরুষ বলে গণ্য করে। আব্রাহাম **সুমের** অঞ্চলে বাস করতেন। পরে ইহুদীরা মেসোপটেমিয়া থেকে বিতাড়িত হয়।

মিশরে বন্দিদশা ঃ তারা ক্রমেই দক্ষিণে অগ্রসর হ'তে থাকে এবং মিশরে প্রবেশ করে। **হিক্‌সস্‌** জাতির লোকেরা মিশর জয় করলে মিশরে ইহুদীদের ব্যবসায়ের সুবিধে হয়। হিক্‌সস্‌রা ছিল পশুপালক, ইহুদীরাও ছিল পশুপালক। মিশরে তারা উভয়েই ছিল বিদেশী। তাই তারা পরস্পরের সহযোগিতা করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। মিশরে হিক্‌সস্‌দের রাজত্বকালে ইহুদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পায়। প্রায় দু শতাব্দী পরে মিশরীরা হিক্‌সস্‌দের মিশর থেকে তাড়িয়ে দেয়।

মিশরে হিক্‌সস্‌দের রাজত্ব শেষ হ'লে ইহুদীদের দুঃখের দিন শুরু হয়। বিদেশী এবং হিক্‌সস্‌দের বন্ধু ব'লে মিশরীরা ইহুদীদের খুবই ঘৃণা করত। এখন তারা ইহুদীদের ক্রীতদাসে পরিণত করল। তাদের কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করল ; বাঁধ, পথঘাট, প্রাসাদ-মন্দির, পিরামিড প্রভৃতির নির্মাণকার্যে তাদের নির্মমভাবে খাটাতে লাগল। ইহুদীদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা রইল না। অথচ মিশর থেকে পালাবার উপায় ছিল না। ইহুদীরা যাতে মিশর ছেড়ে পালাতে না পারে, সেজন্যে মিশরের চারদিকে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা ছিল।

ইহুদীদের এইভাবে মিশরে বন্দিদশায় কাটাতে থাকে। ফারাও **দ্বিতীয় রামেসিসের** সময়ে দেশে নির্মাণকার্য খুব বৃদ্ধি পায়। তখন এদের খাটানো হয়। এদের দুঃখ-দুর্দশা চরমে ওঠে।

বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ ঃ এই সময়ে ইহুদীদের মধ্যে এক মহান্‌ নেতার অভ্যুদয় ঘটে। এঁর নাম **মোজেস** বা **মুশা**। আব্রাহাম যে দেবতার পুজো করতেন, তাঁর নাম **জিহোভা**। মুশা ইহুদীদের বোঝান যে, তাদের দুঃখের দিন অবসান হ'তে চলেছে ; জিহোভা তাদের এই বন্দিদশা থেকে মুক্ত করবেন। জেহোভা তাদের বাসভূমি দানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। ইহুদীরা মুশার কথা বিশ্বাস করল এবং তাঁর নেতৃত্বে মিশর ছেড়ে পালাবার সংকল্প করল।

গোপনে মিশর থেকে ইহুদীদের নিয়ে চললেন মুশা। কিন্তু ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস্ ইহুদীদের পালাবার সংবাদ পেলেন। তিনি ইহুদীদের ধরে আনবার জন্যে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে।

ইহুদীরা মিশর থেকে পালাচ্ছে মুক্তির সন্ধানে। আর মিশরী সৈন্যরা তাদের পিছু পিছু ছুটে চলেছে তাদের বন্দী করতে। ইহুদীরা লোহিত সাগরের তীরে এসে পেঁছিল। সম্মুখে সমুদ্রের উত্তাল জলতরঙ্গ, আর পেছনে ফারাওয়ের সৈন্যবাহিনী। ইহুদীদের নেতা মুশা সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে জিহোভার কাছে প্রার্থনা জানালেন। তখন লোহিত সাগরের উত্তাল জলরাশি শান্ত হয়ে দুদিকে স'রে গেল। মাঝে বেরিয়ে পড়ল শুষ্ক প্রশস্ত পথ। সেই পথ ধরে মুশা ইহুদীদের নিয়ে সমুদ্রের অপর পারে গিয়ে পেঁছিলেন। পিছু পিছু সেই পথে ছুটে এল ফারাওয়ের সৈন্যবাহিনী। তারা যখন সমুদ্রের মাঝামাঝি পেঁছিল, তখন যে উত্তাল জলরাশি দুদিকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তা প্রচণ্ডবেগে নেমে এলো এবং ফারাওয়ের সৈন্যবাহিনী, তাদের রথ, ঘোড়া, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

নূতন বাসভূমি ঃ ইহুদীরা এগিয়ে চলল দেবতার প্রতিশ্রুত বাসভূমির সন্ধানে—এসে পেঁছিল **প্যালেস্টাইনে**। যে সংকীর্ণ স্থলভাগ এশিয়া ও আফ্রিকাকে যুক্ত করেছে, সেখানেই প্যালেস্টাইন অবস্থিত। **ফিলিস্টাইন** নামে এক জাতি এখানে বাস করত। তাদের নাম থেকে এই স্থানের নাম হয়েছিল প্যালেস্টাইন। ইহুদীরা যখন এসে পেঁছিল, তখন **ক্যানানাইট** নামে এক জাতির লোক এখানে বাস করত। এই অঞ্চল ছিল পাহাড়ে পূর্ণ। ইহুদীরা পাহাড়ের গায়ে তাদের পশুচারণ ক্ষেত্র রচনা করল। তাদের পূর্বপুরুষদের পশুপালন বৃত্তিকেই তারা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করল। ক্যানানাইটরা ছিল অপেক্ষাকৃত সভ্য। তাদের সংস্পর্শে এসে ইহুদীরাও সভ্য হয়ে উঠল ; কৃষিকার্য, শ্রমশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য শিখল।

প্যালেস্টাইন পাহাড়ে পূর্ণ হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। তাই এরা গোড়ার দিকে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। পরে ফিলিস্টাইনদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে এরা ঐক্যবদ্ধ হল। **সল, ডেভিড, সলোমন** প্রভৃতি রাজাদের নেতৃত্বে গ'ড়ে তুলল একটি ঐক্যবদ্ধ রাজ্য।

২. ইহুদীদের ধর্ম

এক ও নিরাকার ঈশ্বর ঃ মুশা কেবল ইহুদীদের জাতীয় নেতা ছিলেন না—তিনি ছিলেন এক নবধর্মের প্রচারক। তিনি যখন মিশরে ছিলেন, তখন সম্ভবত আখ্নাতনের এক ও নিরাকার ঈশ্বরের কথা শুনেছিলেন। পশুপালকদের যাযাবর জীবন যাপন করতে হ'ত। তাদের বাস করতে হ'ত ছাউনিতে। তাই ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতকেই ছিল তাদের ভয়। আব্রাহাম-পূজিত জিহোভা ছিলেন ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের দেবতা। তিনি এখন হলেন ইহুদীদের এক ও নিরাকার দেবতা, নির্যাতিত ইহুদীদের পরিত্রাতা।

কিংবদন্তীতে আছে, একদিন মুশা দুটি প্রস্তরফলক নিয়ে পাহাড়ে গেলেন। ঝড়-বৃষ্টি অন্ধকার নেমে এল পাহাড়ে। মুশা যখন তাঁর প্রস্তরফলক দুটি নিয়ে ফিরে এলেন, তখন তাতে দেখা গেল, বজ্র-বিদ্যুতের অগ্নি-অক্ষরে লেখা আছে বিধাতা জিহোভার দশটি আদেশ বা অনুশাসন। এই দশটি আদেশ প্রত্যেক ইহুদীর কাছে অবশ্য-পালনীয়।

এই **দশ** আদেশ হ'ল ঃ (১) পিতামাতাকে সম্মান ক'রো ; (২) কাউকে হত্যা ক'রো না ; (৩) চরিত্রভ্রষ্ট হ'য়ো না ; (৪) চুরি ক'রো না ; (৫) মিথ্যা সাক্ষী দিও না ; (৬) অপরের সম্পদের প্রতি লোভ দিও না ; (৭) মূর্তিপুজো ক'রো না ; (৮) ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় ; (৯) বৃথা—অর্থাৎ লোক-দেখানোভাবে ভগবানের নাম নিও না ; (১০) পবিত্র কাজের জন্য সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট রেখো।

ইহুদীদের ধর্মের কথা বাইবেলের **ওল্ড টেস্টামেন্টে** লেখা আছে।

মুশা প্যালেস্টাইনে এসে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই নগরের নাম দিলেন **জেরুসালেম** বা **শান্তির আবাস**। জেরুসালেমে এক মন্দিরে জিহোভার **দশ আদেশ** রক্ষিত হ'ল। ঐ মন্দিরে কোন দেবতার মূর্তি রইল না। ঐ পবিত্র ফলক দুটি ছিল কতকটা আমাদের দেশের শিখদের গ্রন্থসাহেবের মতো। ঐ মন্দিরকে বলা হ'ত **সিনাগগ** বা **ভজনালয়**। পরবর্তীকালের গির্জা ও মসজেদের সূচনা এই সিনাগগেই।

অনুশীলনী

১। ইহুদীরা কিভাবে মিশরে গিয়েছিল ? গোড়ার দিকে সেখানে তাদের অবস্থা কেমন ছিল ?
২। মিশরে ইহুদীরা কেন বন্দিদশায় ছিল ?
৩। মিশরে বন্দিদশা থেকে ইহুদীদের কে কিভাবে মুক্ত করেছিলেন ?
৪। ইহুদীদের মিশর থেকে পলায়ন সম্পর্কে কি গল্প প্রচলিত আছে ?
৫। প্যালেস্টাইন কোথায় অবস্থিত ? কেন প্যালেস্টাইন নাম হয়েছিল ? প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যা জান লিখ।
৬। ইহুদীদের ধর্ম সম্পর্কে যা জান লিখ।
৭। ইহুদীদের দশ আদেশ বা অনুশাসন সম্পর্কে যা জান লিখ।
৮। ঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও ঃ
(ক) ইহুদীরা তাদের পূর্বপুরুষ মনে করত জিহোভাকে/আব্রামকে/মুশাকে।
(খ) ইহুদীদের দেবতার নাম আমন-রা/মার্দুক/জিহোভা।
(গ) ইহুদীদের উপাসনালয়ের নাম গির্জা/মসজেদ/সিনাগগ।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। ইহুদীদের দেবতার নাম কি ?
২। ইহুদীরা কাকে তাদের পূর্বপুরুষ মনে করত ?
৩। ইহুদীদের মিশরে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন কে ?
৪। প্যালেস্টাইন নাম কেন হয়েছিল ?
৫। ইহুদীদের ধর্মের কথা কোন্ গ্রন্থে লেখা আছে ?
৬। ইহুদীদের উপাসনা-মন্দিরকে কি বলে ?
৭। 'জেরুসালেম' শব্দের অর্থ কি ?
৮। কে জেরুসালেম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গ্রীস

১· গ্রীকদের আগমন—ক্রীটান সভ্যতা

গ্রীকদের আগমন ঃ গ্রীস বলতে বোঝায় **ঈজিয়ান সাগরের** পশ্চিমে অবস্থিত উপদ্বীপ ও তার আশপাশের দ্বীপগুলিকে। এই ভূখণ্ড পর্বতে ও সমুদ্রের খাঁড়িতে পূর্ণ। তাই এর এক স্থানের সঙ্গে অন্য স্থানের যোগাযোগ ঘটে সংকীর্ণ গিরিপথ বা জলপথ দিয়েই। এই ভূখণ্ডের মধ্যভাগের নাম **এটিকা**। এটিকার দক্ষিণে **করিন্থ সাগর**। তার দক্ষিণে অবস্থিত ভূখণ্ডের নাম **পেলোপনেসাস**। এটিকা ও পেলোপনেসাস পূর্ব দিকে **করিন্থ যোজকের** দ্বারা সংযুক্ত।

ঈজিয়ান সাগরীয় অঞ্চল

মধ্য-এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য-ইউরোপ থেকে আর্যজাতির দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। আর্যজাতির কতকগুলি উপজাতি দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের তৃণভূমি ছেড়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে গ্রীসের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল এখন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে।

তারা বহু উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এইসব উপজাতি একের পর এক এসেছিল। এরা গ্রীসের ভূখণ্ড ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিকে বলত **হেলাস**। আর নিজেদের বলত **হেলেনিজ**।

ক্রীটান সভ্যতা ঃ উত্তর থেকে গ্রীকরা যখন গ্রীসদেশে প্রবেশ করে, তখন ঈজিয়ান সাগরের মুখে ভূমধ্যসাগরে **ক্রীট** নামে একটি দ্বীপ অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসভ্য ছিল। গ্রীকরা ছিল কৃষক ও পশুপালক। তারা অন্যান্য আর্য উপজাতির মতো লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানত। তবে তারা ক্রীটানদের তুলনায় দুর্বল ও অসভ্য ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ক্রীটানরা সভ্যতা ও শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। তামার খনি, কৃষি, শিল্প ও সামুদ্রিক বাণিজ্যই ছিল তাদের এই উন্নতির মূলে। ক্রীটের রাজধানী **নোসস** ধনে-সম্পদে পূর্ণ ছিল। গ্রীসের মূল ভূখণ্ডেও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম।

গ্রীক উপজাতিগুলি ক্রীটানদের সংস্পর্শে এসে ক্রমেই সভ্য ও শক্তিশালী হয়ে উঠল। গ্রীসদেশে তারা অনেক নগর, জনপদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গ'ড়ে তুলল। পেলোপনেসাসের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত **মাইসেনি-ই** ছিল তাদের প্রধান রাজ্য। মাইসেনির রাজা সমস্ত গ্রীক রাজ্যগুলির অধিরাজ বলে স্বীকৃত হতেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ক্রীটের রাজধানী নোসস সমুদ্র-দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লুণ্ঠিত ও আগুনে ভস্মীভূত হ'লে ক্রীটানরা দুর্বল হয়ে পড়ল। এই সুযোগে গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে ও ঈজিয়ান অঞ্চলে গ্রীকরা ক্রীটানদের স্থান অধিকার করল।

২. হোমারীয় যুগ

গ্রীস ও ট্রয়ের যুদ্ধ ঃ ঈজিয়ান সাগরের তীরে এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম কোণে ঐ সময়ে **ট্রয়** নামে একটি নগর ও রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের রাজা ছিলেন **প্রিয়াম**। ট্রয়ের রাজপুত্র **প্যারিস** গ্রীসদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি স্পার্টার রাজা **মেনেলসের** সুন্দরী পত্নী **হেলেনকে** অপহরণ ক'রে ট্রয়ে নিয়ে যান। মেনেলসের দাদা ছিলেন মাইসেনির রাজা **আগামেম্‌নন**। হেলেনের এই অপহরণকে সমগ্র গ্রীক জাতি তাদের অপমান বলে মনে করে এবং সমুদ্রপথে অভিযান ক'রে ট্রয় অবরোধ করে। ট্রয় ছিল দুর্ভেদ্য নগরী—পনের ফুট পুরু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। গ্রীকরা দশ বছর ধ'রে ট্রয় নগরী অবরোধ ক'রেও ট্রয় নগরীতে প্রবেশ করতে পারে না। শেষে তারা চাতুরীর আশ্রয় নেয়। তারা ট্রয় ছেড়ে চলে যাওয়ার ভান করে এবং ট্রয়ের সমুদ্রতীরে একটি বিরাট কাঠের ঘোড়া রেখে যায়। ট্রয়বাসীরা মনে করে, গ্রীকরা চলে গেছে। ট্রয়বাসীরা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ঐ কাঠের ঘোড়াটিকে নগরের মধ্যে নিয়ে যায়। রাত্রির অন্ধকারে গ্রীক জাহাজগুলি চুপি চুপি ফিরে আসে। ঐ কাঠের ঘোড়ার মধ্যে লুকিয়েছিল কিছু গ্রীক সৈন্য। তারা রাত্রির

অন্ধকারে ট্রয় নগরীর তোরণ খুলে দেয়। গ্রীক সৈন্যরা ট্রয় নগরে প্রবেশ করে! উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষে গ্রীকরা ট্রয় নগরী ধ্বংস করে।

হোমার ও তাঁর মহাকাব্য ঃ ট্রয় ধ্বংস হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে। তার প্রায় তিন শ বছর পরে ট্রয় ধ্বংসের এই কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন গ্রীসের মহাকবি **হোমার**। ট্রয়ের এক নাম **ইলিয়াম**। তাই থেকে এই মহাকাব্যের নাম **ইলিয়াড**। গ্রীকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন **ওডীসিউস**। ট্রয় ধ্বংসের পরে সমুদ্রপথে নানা দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বদেশে ফেরার কাহিনী নিয়ে হোমার রচনা করেন আর একটি মহাকাব্য। তার নাম **ওডিসি**। ইলিয়াড ও ওডিসি পৃথিবীর প্রাচীনতম দুই মহাকাব্য।

মহাকবি হোমার

হোমারীয় যুগে গ্রীক সমাজ ঃ ইলিয়াড ও ওডিসিতে বর্ণিত যুগকে বলা হয় **হোমারীয় যুগ**। এই দুটি মহাকাব্যে এই যুগের গ্রীকদের সমাজসভ্যতা ও কীর্তিকথা বর্ণিত হয়েছে। গ্রীকরা কৃষি ও নৌচালনায় দক্ষ হ'লেও ছিল পশুপালক। রাজারাও সাধারণ প্রজার মতো জীবন যাপন করতেন। স্বর্ণে, রৌপ্যে ও ব্রোঞ্জে রাজপুরীগুলি পূর্ণ থাকত। তবু রানীদেরও সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো কাজ করতে হত। ভেড়ার পাল রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। গ্রীকরা মৃগয়া ভালোবাসত আর ভোজনবিলাসী ছিল। প্রচুর রুটি, মাংস ও মদ খেত। ভোজসভায় **কবিরা** গান গাইতেন। বীর যোদ্ধারা রথে চড়ে যুদ্ধ করতেন। বীরদের মধ্যে দ্বৈরথ যুদ্ধ হত।

এই মহাকাব্য থেকে গ্রীকদের ধর্মের কথাও জানা যায়। কারণ, আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত বীরদের মতোই এই দুই মহাকাব্যে বর্ণিত বীররা ছিলেন দৈব শক্তিতে বলীয়ান, কেউ বা দেবতার রোষে দুর্বল, অনেকের আবার দেবাংশে জন্ম। গ্রীসের উত্তরে অবস্থিত **অলিম্পাস** পর্বতে থাকতেন দেবতারা। দেবতাদের রাজা ছিলেন **জিউস**। তিনি আমাদের বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্রের মতোই

বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা। তাঁর কেশদাম কম্পিত হ'লে সারা বিশ্ব কম্পিত হ'ত—এমনই ছিলেন তিনি শক্তিমান্। সমুদ্র ও অশ্বের দেবতা ছিলেন **পসিডন**; সংগীত ও রোগ-নিরাময়ের দেবতা **অ্যাপলো**। যুদ্ধের দেবতা **আরিস**; কলাবিদ্যার দেবী **অ্যাথেনা**; প্রেমের দেবী **অ্যাফ্রোদিতে**; মৃগয়ার দেবী চিরকুমারী **আর্টেমিস** ইত্যাদি। গ্রীকরা মানুষের মূর্তিতেই দেবতার কল্পনা

গ্রীক দেবরাজ জিউস

গ্রীক দেবী আথেনা

করেছিল। মানুষের মতো তাঁরা ছিলেন মমতা, ক্রোধ, ঈর্ষা, পক্ষপাত প্রভৃতির বশবর্তী। মানুষ দেবতার করুণা প্রার্থনা ক'রে উপাসনা করত, নৈবেদ্য দিত, বলি দিত। মানুষের যা ক্ষতি হ'ত, তা দেবতার অকারণ রোষে নয়, মানুষেরই অপরাধে।

৩. নগর-রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব—সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান

বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্র ও গ্রীক অনৈক্য ঃ গ্রীস দেশের অসংখ্য পাহাড়, সমুদ্র ও সমুদ্রের ফাঁড়িগুলি সমগ্র অংশের মধ্যে যোগাযোগের প্রবল অন্তরায় ছিল। তাই এক-একটি পাহাড়ের উপত্যকায় এক-একটি গ্রীক উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছিল। এই উপনিবেশগুলি এক-একটি নগরকে কেন্দ্র ক'রে এক-একটি রাষ্ট্রে

পরিণত হ'ল। নগরটি পাহাড়ের উঁচু জায়গায় অবস্থিত হওয়ায় এর নাম হ'ল **অ্যাক্রপলিস**। অ্যাক্রপলিসই ছিল গ্রীক রাষ্ট্রের কেন্দ্র—রাষ্ট্রের সকল মানুষের মিলনস্থল। অ্যাক্রপলিসগুলি ছিল সুরক্ষিত। এগুলি ক্রমেই সুন্দর প্রাসাদে ও মন্দিরে সুশোভিত হয়ে উঠল। নগর-রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই নিজেদের সমস্যাগুলি আলোচনার জন্যে এখানে মিলিত হ'ত।

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের নাগরিক ও শাসন-ব্যবস্থা ঃ এইভাবে-গ্রীসদেশে বহু নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। **আথেন্স, স্পার্টা, থিবিস, করিন্থ** ইত্যাদি। গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি ছোট হওয়ায় নাগরিকের সংখ্যাও কম ছিল। আবার রাষ্ট্রের অধিবাসী ক্রীতদাস ও স্ত্রীলোকেরা নাগরিক ব'লে গণ্য হ'ত না। তাই রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থায় সকল নাগরিকই প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিত। গোড়ার দিকে নগর-রাষ্ট্রগুলিতে রাজাই ছিলেন শাসক। তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে অভিজাত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত পরিষদ থাকত।

কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে প্রায় সকল গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র লোপ পেল। দেশের অভিজাত ব্যক্তিরাই শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে লাগলেন। অভিজাতরা অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থই দেখতেন। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দিত। অনেক সময় কোন কোন অভিজাত ব্যক্তি জনসাধারণের স্বার্থ-রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খুবই জনপ্রিয় হতেন এবং জনসাধারণের ভোটে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠতেন। এঁদের বলা হ'ত **টাইরেণ্ট**। টাইরেণ্টরা রাজা ছিলেন না ; তাঁরা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। নির্বাচিত হওয়ার পরে তাঁরা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারেই কাজ করতেন। তাই তাঁরা স্বৈরাচারীও হয়ে উঠতেন। অনেকে দেশের কল্যাণের জন্যে প্রাণপাতও করতেন। এঁদের সর্ব-শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আথেন্সের টাইরেণ্ট **পেরিক্লিস**। তিনি একটানা ত্রিশ বছর আথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিনি নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। আথেন্সবাসীরা তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করত, দেবরাজ জিউসের সঙ্গে তুলনা করত।

পেরিক্লিস

সভ্যতা-সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঃ নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ থাকলেও

সকলেই নিজেদের গ্রীক মনে করত। গ্রীসের প্রাচীন ঐতিহ্য ও কীর্তিকে তারা সকলেরই ঐতিহ্য ও কীর্তি ব'লে মনে করত। বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে সকলেই গর্ববোধ করত। তাই বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রগুলির সভ্যতা-সংস্কৃতির অবিরাম আদান-প্রদান চলত। এইভাবে গড়ে উঠেছিল এক অখণ্ড গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

৪. উপনিবেশ স্থাপন

উপনিবেশ স্থাপনের কারণ ঃ গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ছোট ছিল। সমুদ্রে পর্বতে সীমাবদ্ধ হওয়ায় জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ ছিল না। দেশে এক শ্রেণীর লোক অত্যন্ত গরীব হয়ে পড়েছিল এবং অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ ব্যয়ে গ্রীসের বাইরে উপনিবেশ স্থাপনের সংকল্প করল।

উপনিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঃ রাষ্ট্রের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমুদ্রপারে কোথাও একটি স্থান নির্বাচন করতেন। নির্বাচিত স্থানে জাহাজে ক'রে রাষ্ট্রের কিছুসংখ্যক নর-নারীকে নিয়ে যাওয়া হ'ত এবং সেখানে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হত। উপনিবেশ স্থাপনের সকল ব্যয় রাষ্ট্রই বহন করত। তাই নতুন উপনিবেশের মানুষরা তাদের মাতৃ-রাষ্ট্রের অনুগত থাকত এবং এগুলি মাতৃরাষ্ট্রের বাণিজ্য-কেন্দ্র হয়ে উঠত। পরে এগুলি স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রে পরিণত হ'লেও মাতৃ-রাষ্ট্রের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ও হৃদয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হ'ত না। এইভাবে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে বহু স্থানে অসংখ্য গ্রীক উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছিল। গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এগুলির দান গ্রীসের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী **আর্কিমিডিস** ছিলেন গ্রীক উপনিবেশ সাইরাকিউসের অধিবাসী।

৫. আথেন্স ও স্পার্টা—সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন

কোরিন্থ যোজকের উত্তরে **এটিকায়** প্রধান নগর-রাষ্ট্র ছিল **আথেন্স**। কোরিন্থ যোজকের দক্ষিণে পেলোপেনেসাসে প্রধান নগর-রাষ্ট্র ছিল **স্পার্টা**। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে আথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে পার্থক্য ছিল দুস্তর।

আথেন্স ঃ কলাশিল্পের দেবী আথেনার নাম অনুসারেই হয়েছিল এই নগর-রাষ্ট্রের নাম আথেন্স। আথেনাই ছিলেন আথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গ্রীক শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির লীলাভূমি ছিল আথেন্স। এখানে গ্রীসের অন্যান্য সকল নগর-রাষ্ট্রের মতোই গোড়ার দিকে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। পরে কিছুদিন এখানে অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন প্রচলিত হয়, রাজতন্ত্র লোপ পায়। কিন্তু আথেন্সের নাগরিকরা দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় নেতারাই—টাইরেণ্টরা—আথেন্সের শাসক হয়ে ওঠেন।

টাইরেণ্টরা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। তাই আথেন্সে মূলত গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। গণতন্ত্র ছিল আথেন্সের রাজনৈতিক আদর্শ।

স্পার্টা ঃ স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ছিল এর বিপরীত। যখন গ্রীকরা বাহুবলে স্পার্টায় অধিকার বিস্তার করেছিল, তখন তারা পূর্বের অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। স্পার্টায় স্বাধীন নাগরিকের তুলনায় ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল খুব বেশি—প্রতি স্বাধীন নাগরিকে ছিল বিশজন ক্রীতদাস। একবার এইসব ক্রীতদাস প্রচণ্ড বিদ্রোহ করেছিল। স্পার্টানরা এই বিদ্রোহ দমন করলেও ঐরূপ ভয়ংকর বিদ্রোহ আবার কখন দেখা দেয়, সেই ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। তাই তারা সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলাকে বিদায় জানিয়ে বাহুবল-অর্জনেই আত্মনিয়োগ করেছিল। সুকুমার হৃদয়বৃত্তিকে তারা দুর্বলতা মনে করত।

শিশুকাল থেকেই স্পার্টান বালকদের সামরিক শিক্ষায় নিযুক্ত করা হত। দুর্বল শিশু জন্মালে তাকে মেরে ফেলা হ'ত। সাত বছর বয়সে স্পার্টান বালককে সেনানিবাসে শিক্ষালাভের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। তাদের সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্যে তাদের নিয়মিত চাবকানো হ'ত। তাদের দেহকে বলিষ্ঠ ক'রে তোলার জন্যে তাদের নিয়মিত ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ এবং নিষ্ঠুর খেলাধূলায় ব্যস্ত রাখা হ'ত। কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা এদের নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ও চিন্তাশক্তি লোপ ক'রে দেওয়া হ'ত। (এদের চুরি করতে উৎসাহ দেওয়া হ'ত, কিন্তু ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি দেওয়া হ'ত। স্পার্টানদের মতে, চুরি করা অপরাধ নয়, ধরা পড়াই অপরাধ।) এদের জীবনে সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধকে প্রশ্রয় দেওয়া হ'ত না। শক্তি, সাহস, শৃঙ্খলা, বিনা বিচারে আদেশ পালন এবং নৃশংসতা ছিল এদের জীবনের আদর্শ। এইভাবে স্পার্টানরা একটি নির্মম যোদ্ধার জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

Item 4.

স্পার্টা গণতন্ত্রের বিরোধী ছিল। সেখানে রাজার শাসন বা রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। একজন রাজা পাছে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন, তাই দুজন রাজা থাকতেন। অভিজাত সম্প্রদায় খুবই প্রবল ছিল।

৬. আথেন্স ও স্পার্টার বিরোধ

সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শে ভিন্ন হওয়ায় আথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে বিরোধ ও রেষারেষি ছিল। অনেকগুলি গ্রীক নগর-রাষ্ট্র আথেন্সের অনুগত ছিল, আবার অনেকগুলি নগর-রাষ্ট্র অনুগত ছিল স্পার্টার। তাই বাইরের শত্রুর আক্রমণের সময়েও গ্রীকরা ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারত না।

পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ ঈজিয়ান সাগরের পূর্ব-উপকূলে এশিয়া মাইনরে যেসব

গ্রীক রাষ্ট্র ছিল, পারস্য সেগুলি অধিকার করেছিল। ঐসব গ্রীক রাষ্ট্র বিদ্রোহ করলে আথেন্স তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। পারস্য-সম্রাট দয়ায়ুস এই বিদ্রোহ দমন করলেন এবং আথেন্সকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাইলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে প্রায় চল্লিশ হাজার পারসিক সৈন্য ঈজিয়ান সাগর পার হয়ে আথেন্সে এসে পৌঁছল। আথেন্স স্পার্টার সাহায্য চাইল। কিন্তু স্পার্টা নির্বিকার রইল। তবু আথেন্সের নাগরিকরা আত্মসমর্পণ করল না। **মিলটিয়াডিস** নামে এক সেনাপতির নেতৃত্বে আথেন্স-বাহিনী পারসিক বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্যে **মারাথনের** প্রান্তরে এসে সমবেত হ'ল। তারা সংখ্যায় পারসিক বাহিনীর অর্ধেক ছিল। তবু তাদের দেশপ্রেম ও শৌর্য মারাথনের যুদ্ধে পারসিক বাহিনীকে পরাস্ত করল। পারসিক বাহিনী দ্রুত গ্রীস ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল।

মারাথনের রণক্ষেত্র থেকে আথেন্স শহরের দূরত্ব ছিল প্রায় পঁচিশ মাইল। এই দীর্ঘপথ প্রাণপণে একটানা ছুটে একজন সৈনিক এই বিজয়বার্তা আথেন্সে পৌঁছে দিল এবং বিজয়বার্তা ঘোষণা ক'রেই মারা গেল। এইভাবে দীর্ঘপথ একটানা প্রাণপণ দৌড় থেকেই **মারাথন** দৌড় প্রতিযোগিতার নামকরণ হয়েছে।

মারাথনের যুদ্ধে জয়ী হ'লেও আথেন্স জানত, এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ নয়। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে পারস্য প্রস্তুত হতে লাগল। আথেন্সও নিজেকে প্রস্তুত করল। পূর্বের তুলনায় সে নিজেকে নৌ-শক্তিতে অনেক বলীয়ান ক'রে তুলল। ইতিমধ্যে দরায়ুসের মৃত্যু হয়েছিল। দরায়ুসের পুত্র **জেরেক্‌সিস** মারাথন যুদ্ধের দশ বছর পরে চার লক্ষ সৈন্য ও বারো শ যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে গ্রীস অভিযান করলেন। আথেন্স অন্যান্য গ্রীক-রাষ্ট্রের সাহায্য চাইল। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য গ্রীক-রাষ্ট্রের সঙ্গে স্পার্টাও পারসিক বাহিনীর প্রতিরোধে অগ্রসর হ'ল। স্পার্টার রাজা **লিওনিডাস** কিছুসংখ্যক বাছাই-করা সৈন্য নিয়ে **থার্মোপাইলির** সংকীর্ণ গিরিপথে পারসিক বাহিনীর প্রতিরোধ করতে লাগলেন। লিওনিডাস ও তাঁর সৈন্যরা যে অতুলনীয় বীরত্ব দেখালেন, তা ইতিহাসে অমর হয়ে রইল। তাঁরা মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে অগণিত শত্রুসেনা বধ ক'রে দেশের জন্য প্রাণ দিলেন। কিন্তু পারসিক বাহিনীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হ'ল না।

পারসিক বাহিনী আথেন্স অধিকার ক'রে শহরে আগুন দিল। তবু আথেন্স শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করল না। স্থলে গ্রীক বাহিনী পরাজিত হ'লেও আথেন্সের নৌবাহিনী **সালামিস** ও **মাইকেলের** যুদ্ধে পারসিক নৌবহরকে বিধ্বস্ত করল। নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়ে জেরেক্‌সিস গ্রীস ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পারসিক বাহিনী **প্লাটিয়ার** যুদ্ধেও পরাজিত হ'ল। আথেন্সের নৌশক্তি গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষা করায় সারা গ্রীসে আথেন্সের মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। আথেন্সের নেতৃত্বে ঈজিয়ান সমুদ্রের ও এশিয়া মাইনরের গ্রীক

রাষ্ট্রগুলি একটি সংঘ গ'ড়ে তুলল। ফলে এইসব গ্রীক রাষ্ট্রের উপর আথেন্সের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

পেলোপনেসীয় যুদ্ধ : আথেন্সের এই শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে স্পার্টা ঈর্ষান্বিত হ'ল। স্পার্টার নেতৃত্বে অবশেষে দক্ষিণ গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি সংঘবদ্ধ হ'ল এবং আথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই যুদ্ধ **পেলোপনেসীয় যুদ্ধ** নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ প্রায় সাতাশ বছর ধরে চলেছিল। যুদ্ধের শুরুতে আথেন্সে এক মহামারী হয় এবং মহা-নায়ক পেরিক্লিসের মৃত্যু ঘটে। যুদ্ধে স্পার্টার কাছে আথেন্স পরাজিত হ'ল এবং গ্রীসে তার প্রাধান্য রইল না।

গ্রীসে স্পার্টার প্রাধান্যও দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। প্রায় পঁচিশ বছর পরে **থিবিস** নগর-রাষ্ট্রের হাতে স্পার্টার পরাজয় ঘটল। কয়েক বছর পরে থিবিসেরও পতন হ'ল। এইভাবে গ্রীসে আর কোন শক্তিশালী নগর-রাষ্ট্র রইল না।

৭. মানব-সভ্যতায় আথেন্সের দান

গ্রীসের সুবর্ণ যুগ : মানব-সভ্যতায় গ্রীসের দান অতুলনীয়। গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল আথেন্সে। আথেন্সের সুবিখ্যাত নায়ক **পেরিক্লিসের** শাসনকালই ছিল আথেন্সের সুবর্ণ যুগ। পেরিক্লিস আথেন্সকে কেবল প্রাসাদে, মন্দিরে, মূর্তিতে সুশোভিত করেননি, তিনি আথেন্সকে ক'রে তুলেছিলেন—তাঁর নিজের ভাষায়—**গ্রীসের শিক্ষালয়**। তাই এই সময়ে শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে আথেন্স অভাবনীয় উন্নতি করেছিল।

সক্রেতিস

সাহিত্য : আথেন্স এই যুগে নাট্যসাহিত্যে অভাবনীয় উন্নতি করেছিল। **ঈস্‌কাইলাস, সফোক্লিস** ও **ইউরিপিদিস** বিয়োগান্ত নাটকে এবং **এরিস্টোফেনিস** মিলনান্ত নাটকে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

দর্শন : এই যুগে আথেন্সে বহু দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে **সক্রেতিস** সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি প্রশ্নোত্তরের ছলে তাঁর চিন্তাধারা প্রচার করতেন। তিনি প্রচলিত ধ্যানধারণা ও কুসংস্কারকে এমনভাবে আঘাত

করেছিলেন যে, তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হয়েছিল। তিনি হেমলক-লতার তীব্র বিষ রস পান ক'রে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা অমর হয়ে আছে। তাঁর শিষ্য **প্লেটো** তাঁর চিন্তাগুলিকে লিপিবদ্ধ ক'রে যান।

ইতিহাস ঃ এই যুগেই পৃথিবীতে প্রথম ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন পৃথিবীর প্রথম ঐতিহাসিক **হেরোডটাস**। হেরোডটাসকে **ইতিহাসের জনক** বলা হয়। পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের যুদ্ধ-কাহিনী তাঁর ইতিহাসের প্রধান বিষয় হ'লেও তিনি নানা প্রাচীন দেশ ও জাতির কথাও লেখেন। তাঁর পরে **থুকিদিদিস** রচনা করেন পেলোপনেসীয় যুদ্ধের বিবরণ নিয়ে তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ।

হেরোডটাস

শিল্পকলা ঃ স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রকলাতেও আথেন্স এই সময় যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল, তার তুলনা নেই। পারস্য-সম্রাট জেরেক্সিস আথেন্স নগরীকে ভস্মীভূত করেছিলেন। পেরিক্লিস পুনরায় আথেন্সকে সুরম্য প্রাসাদে, মন্দিরে ও মূর্তিতে সুশোভিত ক'রে তোলেন। আথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আথেনার মন্দির **পার্থেনন** বিখ্যাত স্থপতি **ইক্‌টিনাসের** অমর কীর্তি। **ফিডিয়াস** আথেনা দেবীর এক অপূর্ব মূর্তি নির্মাণ করেন। অন্যান্য বহু শিল্পীও আথেন্সকে প্রাসাদে, মন্দিরে ও মূর্তিতে সুসজ্জিত করেন।

৮ মাসিডন ঃ রাজা ফিলিপ ও আলেকজাণ্ডার

মাসিডন ঃ গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়লে গ্রীক জগতে আথেন্স ও স্পার্টার শূন্য স্থান পূরণ করতে উদ্যোগী হয় **মাসিডন**। গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের উত্তরে—এখনকার যুগোশ্লাভিয়ায়—**মাসিডনিয়া** রাজ্য অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং নিজেদের গ্রীক ব'লে ভাবতে শুরু করেছিল।

রাজা ফিলিপ ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে **ফিলিপ** মাসিডনিয়ার রাজা হন। তিনি নিজে গ্রীক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি কিছুকাল থিবসে থেকে গ্রীকদের কাছে যুদ্ধবিদ্যাও শিখেছিলেন। তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন।

তিনি এজন্যে বিশাল সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন এবং সৈন্য-বাহিনীকে যুদ্ধে অভিজ্ঞ ক'রে তোলার জন্যে মাসিডনিয়া ও দানিয়ুব নদীর

মধ্যবর্তী বন্য উপজাতিগুলিকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে তাদের পদানত করলেন এবং আথেন্স ও থিবিসকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে সমগ্র গ্রীসের অধীশ্বর হলেন।

এখন তিনি সমগ্র গ্রীক জগতের নেতারূপে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি এক চক্রান্তের ফলে নিহত হলেন। তাঁর সংকল্প সাধন করার ভার পড়ল তাঁর তরুণ পুত্র **আলেকজাণ্ডারের** ওপর।

আলেকজাণ্ডারঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৬ অব্দে, মাত্র বিশ বছর বয়সে, **আলেকজাণ্ডার** সিংহাসনে আরোহণ করেন। বয়সে তরুণ হ'লেও তিনি অসামান্য বুদ্ধি ও শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক **আরিস্টটলকে** তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত ক'রে তাঁকে গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সুশিক্ষিত ক'রে তুলেছিলেন। সুদর্শন বলিষ্ঠ দেহ, বিদ্যাবুদ্ধি, সুমিষ্ট ব্যবহার, অসম সাহস ও শৌর্যের জন্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। পিতার আদর্শকেই তিনি তাঁর জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করলেন।

আলেকজাণ্ডার

রাজা ফিলিপের মৃত্যুর পর মাসিডনিয়া দুর্বল হয়ে পড়েছে মনে ক'রে উপজাতিগুলি এবং আথেন্স ও থিবিসের মতো গ্রীক রাষ্ট্রগুলি বিদ্রোহ করল। আলেকজাণ্ডার দ্রুত উপজাতিগুলির বিদ্রোহ দমন করলেন। তারপর থিবিস ও আথেন্সের বিদ্রোহ দমন ক'রে বিদ্রোহের শাস্তির দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে থিবিসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন। গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে তিনি থিবিসে কেবল গ্রীক কবি **পিণ্ডারের গৃহটি** ধ্বংস করলেন না।

আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ঃ তারপর তিনি সুবিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে পারস্য-সম্রাট **তৃতীয় দারায়ুসের** বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। সিরিয়ায় এক যুদ্ধে তিনি পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করলেন। তৃতীয় দরায়ুস পলায়ন করলেন এবং ইউফ্রেতিস নদীর পশ্চিমে অবস্থিত সমগ্র এশীয় ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে চাইলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাতে সম্মত হলেন না। সমগ্র এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া তাঁর পদানত হ'ল। ঐ সময় মিশর পারস্যের অধিকারে ছিল। আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার করলেন। তিনি নীল নদের মোহানায় নিজের নামে স্থাপন করলেন নূতন শহর—**আলেকজান্দ্রিয়া**। আলেকজান্দ্রিয়া পরে গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য

মিশর জয় ক'রে উত্তরে অগ্রসর হয়ে আলেকজাণ্ডার ইউফ্রেতিস নদী অতিক্রম করলেন এবং বেবিলনের কাছে **আরবেলার** যুদ্ধে পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩৩৩ অব্দ)। পারস্য সম্রাট পলায়ন ক'রেও নিহত হলেন। সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য আলেকজাণ্ডারের অধিকারে এল।

ছ বছরের মধ্যে উত্তরে মধ্য-এশিয়ার সমরখন্দ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ তাঁর পদানত হয়। তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতেও প্রবেশ করলেন। ঝিলাম নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত পুরুরাজ্যের রাজা তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে তাঁকে বাধা দেন। পুরুরাজ পরাজিত হ'লেও তাঁর সাহস ও পরাক্রমে আলেকজাণ্ডার মুগ্ধ হন। তিনি বন্দী পুরুরাজকে মুক্তি দেন এবং তাঁকে গ্রীক-বিজিত ভারতীয় অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

আলেকজাণ্ডার মিশর থেকে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রচারের কেন্দ্ররূপে অসংখ্য নগরী স্থাপন করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে আর অগ্রসর হ'তে না চাওয়ায় তিনি বেবিলনে ফিরে আসেন এবং সেখানে হঠাৎ জ্বররোগে মারা যান (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দ)। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর।

৯. সাম্রাজ্যের পতন—রোমান অধিকার

সেনাপতিদের বিবাদ ও সাম্রাজ্য ভাগ ঃ হঠাৎ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর প্রধান তিন সেনাপতি **সেলুকাস, টোলেমি ও এন্টিগোনাস** সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সুদীর্ঘকাল যুদ্ধের পর আলেকজাণ্ডার-বিজিত এশীয় অঞ্চল সেনাপতি সেলুকাসের, মিশর সেনাপতি টোলেমির এবং গ্রীস ও মাসিডনিয়া সেনাপতি এণ্টিগোনাসের পৌত্র দ্বিতীয় এণ্টিগোনাসের অধিকারে যায়।

রোমের আক্রমণ ঃ আলেকজাণ্ডার যখন পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ইতালিতে রোম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়াতেই রোম পূর্বদিকে তার প্রভুত্ব বিস্তারে অগ্রসর হয়। অল্প-কালের মধ্যে মাসিডনিয়া, গ্রীস, এশিয়া মাইনর এবং সেলুকাস-বংশীয়দের শাসিত এশীয় সাম্রাজ্য রোমের অধিকারে যায়। রোমানদের হাতে পরাজিত হয়ে মিশরের রানী **ক্লিওপেত্রা** আত্মহত্যা করলে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১ অব্দে মিশর রোমের অধিকারে যায়। এইভাবে আলেকজাণ্ডার-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও লোপ পায়।

অনুশীলনী

১। ক্রীট কোথায় অবস্থিত ? ক্রীটান সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান ?

২ গ্রীসের সঙ্গে ট্রয়ের যুদ্ধ কেন হয়েছিল ? গ্রীকরা কিভাবে ট্রয় নগর ধ্বংস করেছিল ?

৩। হোমার কে ছিলেন? তাঁর লেখা মহাকাব্যগুলির নাম কর। হোমারীয় যুগ বলতে কি বোঝ? হোমারীয় যুগ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৪। গ্রীক দেবদেবীর সম্বন্ধে কি জান?

৫। গ্রীসে নগর-রাষ্ট্রগুলির উদ্ভব হয়েছিল কেন? প্রধান দুটি নগর-রাষ্ট্রের নাম কর। নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফল কি হয়েছিল?

৬। গ্রীকরা গ্রীসের বাইরে কেন উপনিবেশ স্থাপন করেছিল? ঐসব উপনিবেশের সঙ্গে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

৭। গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

৮। 'টাইরেণ্ট' কাকে বলা হ'ত? আথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ টাইরেণ্ট কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে কি জান?

৯। আথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে যা জান লিখ।

১০। স্পার্টানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল?

১১। পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের যুদ্ধের কাহিনী সংক্ষেপে লিখ।

১২। টীকা লিখঃ (ক) গ্রীস ও ট্রয়ের যুদ্ধ; (খ) মারাথনের যুদ্ধ; (গ) থারমোপাইলির যুদ্ধ; (ঘ) পেলোপনেসীয় যুদ্ধ।

১৩। আথেন্সের অভ্যুত্থান ও পতন সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৪। মানব সভ্যতায় আথেন্সের দান বর্ণনা কর।

১৫। টীকা লিখঃ আগামেম্‌নন; লিওনিডাস; মিল্‌টিয়াডিস; জেরেক্‌সিস; পেরিক্লিস; হোমার; সক্রেতিস; হেরোডটাস; ফিডিয়াস; রাজা ফিলিপ; তৃতীয় দরায়ুস।

১৬। ম্যাসিডন কোথায় অবস্থিত ছিল? রাজা ফিলিপের অধীনে ম্যাসিডন কিভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল? রাজা ফিলিপ কি চেয়েছিলেন?

১৭। আলেকজাণ্ডার কে ছিলেন? তিনি কত বয়সে রাজা হয়েছিলেন? তাঁর শিক্ষক কে ছিলেন? আলেকজাণ্ডারের জনপ্রিয়তার কারণ কি?

১৮। আলেকজাণ্ডারের দিক্‌বিজয় সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৯। আলেকজাণ্ডারের পুরুরাজ্য বিজয়ের বিবরণ দাও।

২০। গ্রীস ও গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে যা জান লিখ।

২১। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) পৃথিবীর প্রাচীনতম দুটি মহাকাব্যের নাম —— ও ——। এই মহাকাব্য দুটি রচনা করেন ——। ইতিহাসের জনক বলা হয় —— কে।

(খ) আলেকজাণ্ডারের হস্তে পরাজিত হন পারস্য-সম্রাট ——। ঝিলাম নদীর —— তীরে পুরুরাজ্য অবস্থিত ছিল। আলেকজাণ্ডার —— শহরে —— রোগে আক্রান্ত হয়ে —— বছর বয়সে হঠাৎ মারা যান।

(গ) ক্রীটের রাজধানী ছিল ——। মাইসেনির রাজা ছিলেন ——। তাঁর ভাইয়ের নাম ——। ইনি ছিলেন —— রাজা। এঁর গৃহে ট্রয়ের রাজা —— এর পুত্র —— অতিথি হয়েছিলেন। তিনি —— অপহরণ করলে গ্রীস ও ট্রয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে।

২২। ঠিকভাবে সাজিয়ে বাক্য রচনা কর ঃ

মাইসেনির রাজা ছিলেন	প্যারিস।
আথেন্সের বিখ্যাত টাইরেণ্ট ছিলেন	ফিলিপ।
ট্রয়ের রাজপুত্র ছিলেন	জিউস।
ম্যাসিডনিয়ার রাজা ছিলেন	পেরিক্লিস।
গ্রীকদের দেবরাজ ছিলেন	আগামেম্‌নন।

২৩। ঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও ঃ

(ক) স্পার্টায় রাজতন্ত্র/অভিজাততন্ত্র/গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল।

(খ) গ্রীক দেবরাজের নাম জিহোভা/জুপিটার/জিউস।

(গ) গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন সক্রেতিস/হেরোডটাস/প্লেটো।

(ঘ) মারাথনের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন লিওনিডাস/মিল্‌টিয়াডিস/আগামেম্‌নন।

(ঙ) ট্রয়ের যুদ্ধ নিয়ে হোমার যে মহাকাব্য লেখেন তার নাম ওডিসি/ইলিয়াড/আবেস্তা।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। ক্রীট দ্বীপটি কোথায় অবস্থিত ?

২। গ্রীসের কোন্ অংশে স্পার্টা অবস্থিত ছিল ?

৩। গ্রীকদের দেবরাজ কে ছিলেন ?

৪। 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের নাম 'ইলিয়াড' কেন হয়েছে ?

৫। 'ওডিসি' মহাকাব্যের নাম 'ওডিসি' কেন ?

৬। প্রাচীন গ্রীসে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কে ছিলেন ?

৭। কোন্ দেবীর নাম অনুসারে আথেন্স রাষ্ট্রের নামকরণ হয়েছিল ?

৮। কার শাসনকালকে আথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয় ?

৯। কত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল ?

১০। ট্রয়-যুদ্ধের কতদিন পরে ইলিয়াড মহাকাব্য রচিত হয়েছিল ?

১১। মাসিডন কোথায় অবস্থিত ছিল ?

১২। পেলোপনেসীয় যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল কোন্ রাষ্ট্র ?

১৩। আর্কিমিডিস কোন্ গ্রীক রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন ?

১৪। পিন্ডার কে ছিলেন ? তিনি কোন্ নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন ?

১৫। আলেকজান্ডারের শিক্ষক কে ছিলেন ?

১৬। আলেকজান্ডার কত বছর বয়সে মাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করেন ?

১৭। আলেকজান্ডারের সঙ্গে যে পারস্য-সম্রাটের যুদ্ধ হয়েছিল তাঁর নাম কি ?

১৮। কোন্ কোন্ তিন সেনাপতির মধ্যে আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়েছিল ?

১৯। কত বৎসর বয়সে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয় ?

২০। কোথায় এবং কিসে আলেকজান্ডার মারা যান ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ ৮

রোম

১. রোম নগরের উদ্ভব

এট্রাস্কান ও লাতিন উপজাতিঃ ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের পশ্চিমে একটি উপদ্বীপ আছে, তার নাম **ইতালি**। ইতালির উত্তরাংশ আল্প্স পর্বতমালায় ঘেরা। ইতালির মাঝ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে রয়েছে **অ্যাপেনাইন** পর্বতমালা। এই পর্বতমালার দুদিকে সমুদ্রোপকূলের ভূমি উর্বর। জলবায়ু প্রায় গ্রীসের মতোই। তাই প্রস্তর যুগ থেকে মানুষ এসে এখানে বসবাস করতে থাকে।

গ্রীসের মতোই আর্য জাতির একটি শাখা উত্তর থেকে এখানে এসে পেঁছেছিল। গ্রীকদের আক্রমণের ফলে ক্রীট ও ট্রয়ের সভ্যতাগুলি যখন বিধ্বস্ত হয়েছিল, তখন সেইসব স্থানের কিছু লোকও ইতালিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এরা **এট্রাস্কান** নামে পরিচিত।

ইতালির মধ্য-ভাগে **তাইবার** নদী পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত। তাইবার নদীর উত্তরে এট্রাস্কানরা এবং দক্ষিণে আর্য **লাতিন** উপজাতির লোকেরা বাস করছিল। দক্ষিণ ইতালিতে এবং সিসিলি-দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল গ্রীকরা।

রোমের প্রতিষ্ঠাঃ এট্রাস্কানরা সভ্য হ'লেও ছিল দুর্ধর্ষ ও নৃশংস। লাতিন উপজাতিগুলিকে পদানত ক'রে তাইবার নদীর দক্ষিণেও তারা অধিকার বিস্তারে সচেষ্ট ছিল। লাতিন উপজাতির লোকেরা তাই তাইবার নদীর দক্ষিণ তীরে **প্যালেটাইন** পাহাড়ে একটি সুরক্ষিত নগর স্থাপন করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫০ অব্দে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলা হয়। বলা হয়, **রোমুলাস** নামে এক বীর রাজকুমার এই নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই নাম থেকে নগরীর নাম হয়েছিল **রোম**।

২. প্রথম যুগের রোমান সমাজ—প্যাট্রীসিয়ান ও প্লেবিয়ান

প্রথম যুগের রোমান সমাজঃ লাতিন নামে পরিচিত কতকগুলি আর্য উপজাতি নিয়ে রোমান সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল। গোড়ার দিকে রোমানদের জীবনযাত্রা গ্রীক বা এট্রাস্কানদের মতো উন্নত ছিল না। তারা ছিল কৃষিজীবী। অনেকে পশুপালন করত। তারা কিছু কিছু শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত। শহরে গিয়ে বিনিময়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করত। গ্রামবাসীরা প্রায়ই উৎসব ও কেনাবেচার জন্য শহরে আসত।

অন্যান্য আর্য উপজাতির মতো গোড়ার দিকে তারা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পূজো করত। সম্ভবত পার্শ্ববর্তী গ্রীকদের প্রভাবেই তারা নানা দেবদেবীর কল্পনা ও আরাধনা করতে থাকে। রোমানদের দেবরাজ ছিলেন **জোভ** বা **জুপিটার**; যুদ্ধের দেবতা ছিলেন **মার্স**; বাণিজ্যের দেবতা **মারকারি**; বিদ্যার দেবী **মিনার্ভা**; প্রেমের দেবী **ভেনাস**। গ্রীকদের মতো এরাও মানুষের মূর্তিতে দেবতার কল্পনা করেছিল।

রোমান সমাজে গোড়ার দিকে রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাজতন্ত্র রোমে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একসময়ে এট্রাস্কানরা রোম অধিকার করে এবং এট্রাস্কান-জাতীয় রাজারা রোম শাসন করতে থাকে। এইসব রাজা **টারকুইন** নামে পরিচিত।

টাইকুইনরা রোমের উন্নতির জন্যে অনেক কিছু করলেও ছিল নৃশংস ও অত্যাচারী। শেষ পর্যন্ত রোমানরা বিদ্রোহ করে এবং টারকুইনদের শাসন থেকে মুক্তি পায়। রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। টারকুইনদের শাসন রোমানদের মনে রাজতন্ত্র সম্পর্কে এমন ভয় ও ঘৃণার সঞ্চার করে যে, পরবর্তীকালে রোমের একনায়করাও নিজেদের রাজা ব'লে ঘোষণা করতে ভয় পান।

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান: রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লেও অভিজাতরাই শাসনকার্য চালাতেন। রোমের নাগরিকরা অভিজাত ও সাধারণ—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অভিজাতদের বলা হ'ত **প্যাট্রিসিয়ান** ও সাধারণদের বলা হ'ত **প্লেবিয়ান**।

প্রজাতান্ত্রিক রোমের শাসনব্যবস্থায় এক বছরের জন্যে নির্বাচিত দুজন **কনসাল** থাকতেন। তাঁরা ক্ষমতার সর্বোচ্চ অধিকারী ছিলেন। সংকটকালে ছ মাসের জন্যে একজন **ডিক্টেটর** বা একনায়ক নির্বাচিত হতেন। শাসনকার্য ও বিচারের জন্যে থাকতেন নির্বাচিত **ম্যাজিস্ট্রেটরা**। শাসনকার্যে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে থাকত **সেনেট** বা উচ্চ পরিষদ্। সকল পদ নির্বাচনের দ্বারা পূরণ করা হ'লেও কেবল অভিজাতরাই নির্বাচনে প্রার্থী হ'তে পারতেন। তাই এই শাসন-ব্যবস্থা নামে প্রজাতন্ত্র হ'লেও আসলে ছিল অভিজাততন্ত্র।

অভিজাতরা সকলেই বড় জমিদার ছিলেন এবং নানাভাবে সাধারণ মানুষকে শোষণ করতেন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থে আইন করতেন, বিচার করতেন, শাসন চালাতেন। তাই প্লেবিয়ানরা পদে পদে ক্ষুব্ধ হ'ত ও নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করত। অবশ্য, এই সংগ্রাম কখনো সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হ'ত না। তারা এখনকার ধর্মঘট বা অসহযোগের মতো কৌশল অবলম্বন করত। তারা রোম ছেড়ে শহরের বাইরে চলে যেত এবং সকল বিষয়ে অসহযোগিতা করত। তখন প্যাট্রিসিয়ানরা বাধ্য হয়ে তাদের দাবি মেনে নিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনতেন। প্লেবিয়ানদের অধিকার রক্ষার জন্যে **ট্রিবিউন** বা প্রতিনিধিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের বিধিবদ্ধ আইনগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। পূর্বে প্যাট্রিসিয়ান ও

প্লেবিয়ানদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সংগ্রামের ফলে তা বৈধ হয়েছিল। পূর্বে প্যাট্রিসিয়ানরাই কনসাল, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি নির্বাচিত হ'তে পারতেন। এখন প্লেবিয়ানরা-ও ঐসব পদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

৩. কার্থেজের সঙ্গে সংঘর্ষ

রোমের অধিকার বিস্তার : তাইবার নদীর উত্তরে রোম থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে ছিল এট্রাস্কানদের রাজধানী ভেঈ। রোমানরা ভেঈ বিধ্বস্ত করলে তাইবার নদীর উত্তরেও রোমানদের অধিকার বিস্তৃত হ'ল।

ইতিমধ্যে **গল** ও **কেল্‌ট্** নামে পরিচিত আর্যরা জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন ও দক্ষিণ বৃটেনে অধিকার বিস্তার করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে গলরা উত্তর ইতালি অধিকার ক'রে রোম আক্রমণ করল। প্রবাদ আছে, জুপিটারের মন্দিরের রাজহাঁসগুলির কলধ্বনিতে রোমান সৈনিকরা জেগে ওঠায় তারা রোমের প্রধান অংশ জয় করতে পারেনি; তবে রোমের কিছু অংশ তারা ধ্বংস করেছিল, লুঠতরাজ চালিয়েছিল। রোমানরা তাদের প্রচুর অর্থ দিয়ে বিদায় করে।

গলদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে রোমানরা নিজেদের সামরিক শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি করে। সারা উত্তর ইতালিতে তাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। অল্পকালের মধ্যে দক্ষিণ ইতালিও তাদের পদানত হয়। দক্ষিণ ইতালির পাদদেশে একটি গ্রীক রাজ্য ছিল। রোমানরা এই গ্রীক রাজ্যও জয় করে। এইভাবে রোমের অধিকার ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

কার্থেজ : ইতালির বিপরীত দিকে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে ছিল **কার্থেজ** শহর। একদা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে **ফিনিসীয়** জাতির লোক বাস করত। তারা নৌবাণিজ্যে অতিশয় উন্নত ছিল এবং নৌ-বাণিজ্যের সূত্রে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পারস্যের অভ্যুত্থানের ফলে ফিনিসীয়দের বাসভূমি **ফিনিসিয়া** পারস্যের পদানত হ'লে এইসব উপনিবেশের ফিনিসীয়রা স্বাধীন হয়ে উঠল। তারা কার্থেজ শহরকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে তুলল বিশাল সাম্রাজ্য।

রোমের অধিকার ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় ভূমধ্যসাগরে কার্থেজের আধিপত্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। ফলে রোমের সঙ্গে কার্থেজের বিবাদ ও যুদ্ধ বাধল। রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধ হয়েছিল তিন দফায় প্রায় একশ বিশ বছর ধরে। এই যুদ্ধগুলি **পিউনিক যুদ্ধ** নামে খ্যাত। লাতিন ভাষায় **পোয়েনি** বা **পিউনী** শব্দের অর্থ ফিনিসীয়।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ : সিসিলি দ্বীপের পূর্বাংশে ছিল গ্রীক রাজ্য **সাইরাকিউস**। ঐ দ্বীপে ইতালির দিকের একটি শহরে সাইরাকিউস রাজ্যের কিছু দলত্যাগী

সৈনিক ঘাঁটি গেড়ে দস্যুতা চালাতে থাকে। সাইরাকিউস-রাজ তাদের দমন করতে চাইলে তারা রোমের সাহায্য চায়। রোমের হাতে সাইরাকিউসের রাজা পরাজিত হন এবং পূর্ব সিসিলিতে রোমের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। পশ্চিম সিসিলি ছিল কার্থেজের অধিকারে। কার্থেজ রোমের প্রতিরোধে অগ্রসর হ'লে কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৪ অব্দ থেকে তেইশ বছর চলে। শেষ পর্যন্ত রোম কার্থেজকে পরাজিত করে। কার্থেজ-অধিকৃত সিসিলি, কর্সিকা ও সার্দিনিয়া রোমের অধিকারে যায়।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ ঃ ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য হারিয়ে কার্থেজ স্থলভাগে অধিকার বিস্তারে মন দেয়। দক্ষিণ স্পেন তার অধিকারে ছিল। সে স্পেনে আরও অধিকার বিস্তার করল। ইতিমধ্যে স্পেনের উত্তরাংশে রোম অধিকার বিস্তার করেছিল। কার্থেজ আরো উত্তরে অগ্রসর হ'লে কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধ **দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ** নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ২১৮ অব্দ থেকে ষোল বছর চলেছিল।

কার্থেজের বীর অধিনায়ক **হানিবল** তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তরে অগ্রসর হলেন এবং আল্‌প্‌স্‌ পর্বতমালা পার হয়ে ইতালিতে প্রবেশ করলেন। পর পর অনেকগুলি যুদ্ধে রোমান বাহিনী পরাজিত হ'ল। সম্মুখ যুদ্ধে হানিবলকে পরাজিত করা অসম্ভব বুঝে রোমানরা **কালহরণের** নীতি গ্রহণ করল এবং শেষে তারা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কার্থেজ আক্রমণ করল। রোমানরা কার্থেজ আক্রমণ করায় কার্থেজ রক্ষার জন্যে হানিবলকে কার্থেজে ফিরতে হ'ল। কিন্তু হানিবল **জামার** যুদ্ধে পরাজিত হলেন।

হানিবল

কার্থেজ রোমের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হ'ল। সমগ্র স্পেন ও কার্থেজের নৌবহর রোমের অধিকারে গেল। রোম প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করল। হানিবল পালিয়ে গেলেন। রোমান বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার ভয়ে শেষে আত্মহত্যা করলেন।

তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ ঃ কার্থেজ এইভাবে হীনবল হয়ে পড়লেও চল্লিশ বছরে নিজেকে আবার শক্তিশালী ক'রে তুলল। রোমের তা সহ্য হ'ল না। রোম আবার কার্থেজ আক্রমণ করল (খ্রীঃ পূঃ ১৪৮ অব্দ)। দু বছরের মধ্যে কার্থেজ

পরাজিত হ'ল এবং রোমানরা কার্থেজ নগরীকে ধূলিসাৎ ক'রে দিল। কার্থেজ-অধিকৃত সমগ্র আফ্রিকা রোমের অধিকারে গেল।

৪. রোমান নাগরিকত্ব—ক্রীতদাস-প্রথা—ক্রীতদাস-বিদ্রোহ

রোমান নাগরিকত্ব : গোড়ার যুগে লাতিন উপজাতির লোকেরাই রোমের নাগরিক ছিল। রোমের অধিকার যতোই বিস্তৃত হ'তে লাগল, ততোই রোম-অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকরাও রোমের নাগরিক হ'ল। রোম সাম্রাজ্য যখন পশ্চিমে ইংলণ্ড থেকে পূর্বে মেসোপটেমিয়া এবং দক্ষিণে উত্তর-আফ্রিকা থেকে উত্তরে দক্ষিণ-রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তখনও ঐ সারা অঞ্চলের নাগরিকরা রোমান নাগরিক ব'লে গণ্য হ'ত। রোম সাম্রাজ্যের সুদূর অংশের কোন নাগরিক নির্বাচনকালে রোমে উপস্থিত থাকলে নির্বাচনে ভোট দিতে পারত। তবে ক্রীতদাসরা ও স্ত্রীলোকেরা নাগরিক ব'লে গণ্য হ'ত না।

ক্রীতদাস-প্রথা : সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন দেশে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। তাদের কেনাবেচা চলত। তাদের ন্যূনতম খাদ্যবস্ত্র দেওয়া হ'ত। সকলপ্রকার হীন ও কঠিন মেহনতী কাজ তাদের দিয়েই করানো হ'ত। তারা মালিকের সম্পত্তি ব'লে গণ্য হ'ত। মালিকরা তাদের হত্যা করলেও তা অপরাধ ব'লে গণ্য হ'ত না।

রোমান ক্রীতদাস

রোমানরা যতোই নতুন নতুন দেশ জয় করছিল, ততোই বিজিত অঞ্চল থেকে তারা দলে দলে ক্রীতদাস আনছিল। কৃষি, শ্রমশিল্প ও অন্যান্য মেহনতী সব কাজই ক্রীতদাসদের দিয়ে করানো হ'ত। ক্রীতদাসদের মানুষ ব'লে গণ্য করা হ'ত না। তারা পশুর মতো জীবন-যাপন করত। প্রাচীনকালে হিংস্র পশুর লড়াই দেখে মানুষ আনন্দ পেত। এখন রোমানরা ক্রীতদাসদের লড়াই দেখে আনন্দ পেতে লাগল।

ক্রীতদাসদের লড়াই শেখানো হ'তে লাগল। লড়াই শেখাবার জন্যে অনেক শিক্ষালয়ও খোলা হ'ল। লড়াইয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্রীতদাসকে বলা হ'ত **গ্ল্যাডিয়েটর।** গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই ঐ সময় এতই জনপ্রিয় ছিল যে, গ্ল্যাডিয়েটরের

লড়াই দেখবার জন্যে দেশে বড় বড় প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়েছিল। এইসব প্রেক্ষাগৃহ ছিল বহুতল বিশাল অট্টালিকা। তাতে একসঙ্গে হাজার হাজার লোক বসে লড়াই দেখত। এগুলিকে অ্যাম্‌ফিথিয়েটার ও কলোসিয়াম বলা হ'ত। এগুলি এতই বড় ছিল যে, পরে এগুলির কোন-কোনটি দুর্গে বা প্রাসাদ-দুর্গে পরিণত হয়েছিল।

গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই

ক্রীতদাস-বিদ্রোহ ও স্পার্টাকাসঃ হাজার হাজার গ্ল্যাডিয়েটর ছিল দেশে। উত্তর গ্রীসের থ্রেস থেকে স্পার্টাকাস নামে একজন ক্রীতদাসকে আনা হয়। গ্ল্যাডিয়েটর-রূপে স্পার্টাকাস বিখ্যাত হয়ে ওঠে। লড়াই দেখতে গিয়ে গ্ল্যাডিয়েটরকে তার বহু সঙ্গী ও বন্ধুকে অকারণে হত্যা করতে হ'ত। এই কাজে স্পার্টাকাসের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অন্যান্য
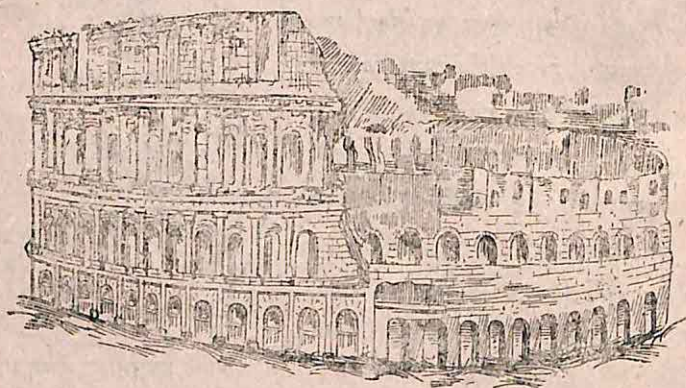
অ্যাম্ফিথিয়েটার

গ্ল্যাডিয়েটরদের মনও এ বিষয়ে স্পার্টাকাসের মতোই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া ক্রীতদাসরাও তাদের উপর অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার সম্পর্কে সচেতন ছিল।

একদিন স্পার্টাকাস লড়াই দেখবার সময়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ না ক'রে উন্মত্তের মতো দর্শকদের আক্রমণ করল। তার সঙ্গে অন্যান্য গ্ল্যাডিয়েটররাও

যোগ দিল। এইভাবে স্পার্টাকাস ও অন্যান্য গ্ল্যাডিয়েটররা নির্বিচারে রোমান নাগরিকদের হত্যা ক'রে বিদ্রোহের সূচনা করল। দলে দলে ক্রীতদাসরাও বিদ্রোহে যোগ দিল। স্পার্টাকাস তার সঙ্গীদের দিয়ে বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরির সুপ্ত
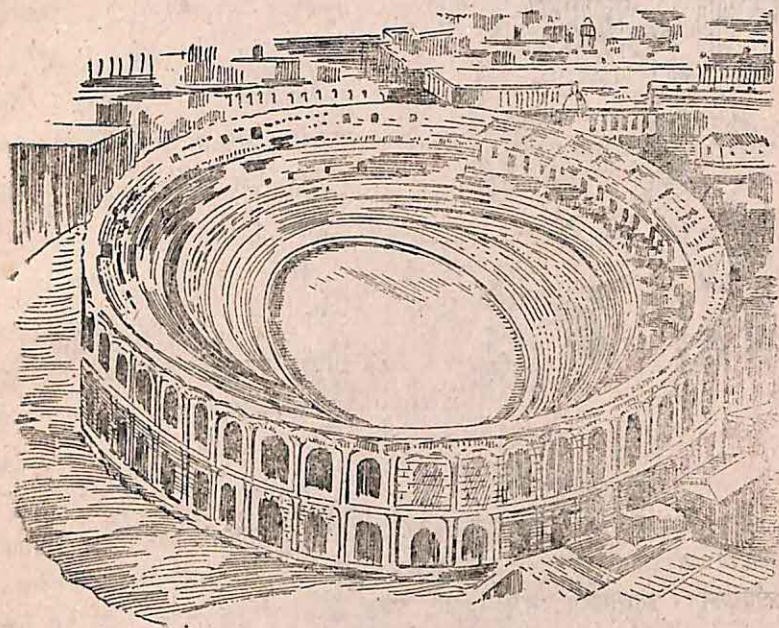
রোমের কলোসিয়াম

জ্বালামুখীতে গিয়ে আশ্রয় নিল। সারা ইতালিতে ক্রীতদাসবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহে প্রায় নব্বই হাজার ক্রীতদাস যোগ দিল। বিদ্রোহী ক্রীতদাসরা ইতালিতে নির্বিচারে হত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও লুঠতরাজ চালাল। স্পার্টাকাস ও তার দল রোমান নাগরিকদের কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠল। দু বছর ধ'রে রোমানরা এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হল। শেষে রোমান সেনাপতি ক্র্যাসাস এই বিদ্রোহ দমন করলেন (খ্রীঃ পূঃ ৭১ অব্দে)।

স্পার্টাকাস নিহত হ'ল। প্রায় ছ হাজার ক্রীতদাস বন্দী হ'ল। বন্দী ক্রীতদাসদের হত্যা ক'রে দক্ষিণ ইতালির প্রধান রাজপথ অ্যাপিয়ান ওয়ে-র দুধারে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। ক্রীতদাসদের দেখানো হ'ল বিদ্রোহের পরিণাম কী!

৫. জুলিয়াস সীজার—প্রজাতন্ত্রের অবসান—নতুন সাম্রাজ্য

জুলিয়াস সীজার: রোমে এখন সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষার জন্যে গড়ে উঠেছিল বিশাল সৈন্যবাহিনী। দেশে সর্বাধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল সৈন্য-

বাহিনীর প্রিয় সেনাপতিরা। ক্রীতদাস-বিদ্রোহ দমন ক'রে **ক্র্যাসাস** খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ঐ সময়ে বিজয়ী বীর-রূপে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন আরো দুজন সেনাপতি—**পম্পি** ও **জুলিয়াস সীজার**। এই তিনজনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল **ট্রায়াম্‌ভিরেট** বা শাসকত্রয়ী। সাম্রাজ্যের কোন্ অংশে কে শাসন ও যুদ্ধ পরিচালনা করবেন, তা স্থির ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

জুলিয়াস সীজার

কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হওয়ার জন্যে এঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। পূর্বদিকে পারস্য আক্রমণকালে ক্র্যাসাস নিহত হ'লে পম্পি ও জুলিয়াস সীজারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল।

পম্পি পূর্বদিকে এবং জুলিয়াস সীজার পশ্চিমদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন। জুলিয়াস সীজার ফ্রান্স ও বেলজিয়াম অধিকার ক'রে দুবার ইংলণ্ডে অভিযান করেছিলেন। ক্র্যাসাসের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তিনি রোমের উদ্দেশে সসৈন্যে ফিরে চললেন। পম্পি তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্যে এগিয়ে এলেন। কিন্তু জুলিয়াস সীজারের কাছে পরাজিত হয়ে মিশরে পালিয়ে গেলেন। জুলিয়াস সীজার তাঁর পশ্চাদ্ধাবন ক'রে মিশরে পেঁছিলেন এবং মিশর জয় করলেন। মিশরে পম্পি নিহত হয়েছিলেন। জুলিয়াস সীজার বিজয়ী বীররূপে রোমে ফিরে সারা জীবনের জন্যে রোম সাম্রাজ্যের একনায়ক নির্বাচিত হলেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৫)।

প্রজাতন্ত্রের অবসানঃ সারা জীবনের জন্যে একনায়ক নির্বাচিত হয়ে তিনি কার্যত সারাজীবনের জন্যে রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটই হয়েছিলেন। কিন্তু রোমানরা রাজতন্ত্র সম্পর্কে তীব্র ভয় ও ঘৃণা পোষণ করত। তাই তিনি প্রকাশ্যে রাজা বা সম্রাট উপাধি গ্রহণ করলেন না। তাঁর ভক্তরা তাঁকে রাজমুকুট পরাতে চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, কিন্তু রাজদণ্ড হাতে নিলেন, সিংহাসনে বসলেন। তিনি মিশরে থাকাকালে মিশরের শেষ রানী **ক্লিওপেত্রার** দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ফারাওদের অনুকরণে নিজেকে দেবতা ব'লে প্রচার করলেন—রোমে একটি মন্দির তৈরি ক'রে তাতে নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

জুলিয়াস সীজার যে নিজেকে রাজা বা সম্রাট ব'লে মনে করেন, তা বুঝতে বাকি রইল না। সীজারের বন্ধু ও জনপ্রিয় অভিজাত **ব্রুটাসের** নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রীরা

প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে চক্রান্ত করলেন। তাঁরা সেনেট-ভবনে জুলিয়াস সীজারকে আক্রমণ করলেন। তাঁর দেহের তেইশ জায়গায় ছুরিকাঘাত ক'রে তাঁকে হত্যা করা হ'ল (খ্রীঃ পূঃ ৪৪)।
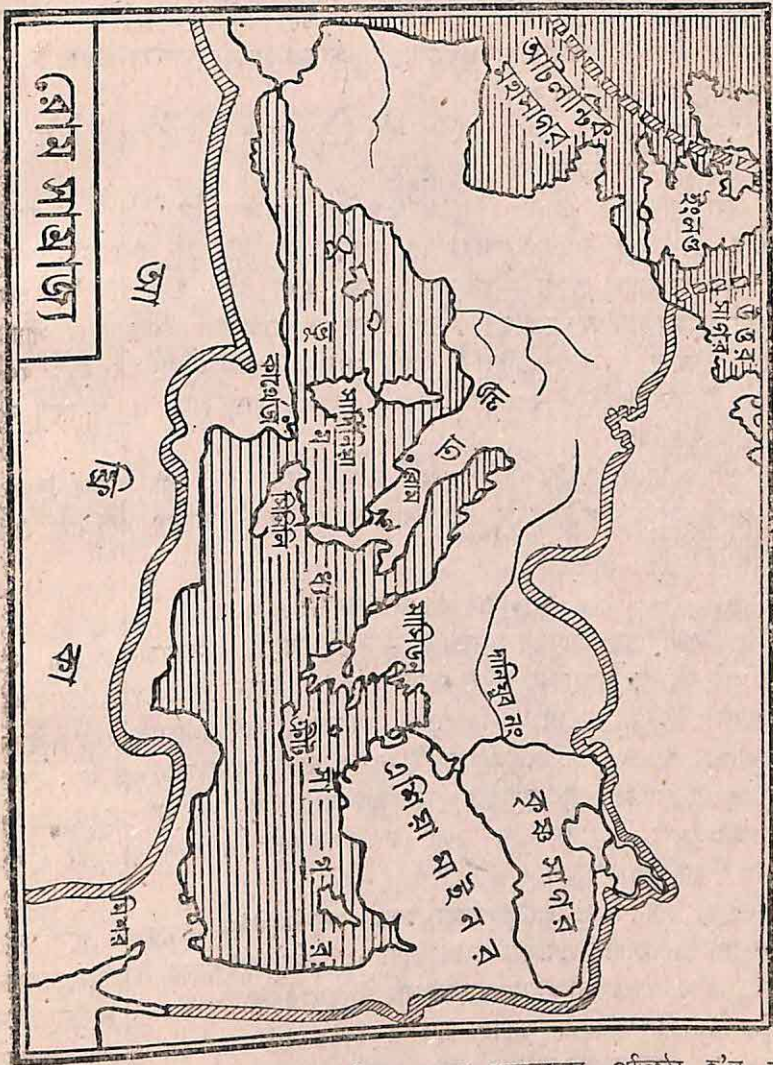
জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুতে কিন্তু রোমে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল না। জুলিয়াস সীজারের একান্ত অনুগত সেনাপতি **মার্ক অ্যাণ্টনী** এবং জুলিয়াস সীজারের তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র **অকটাভিয়াস সীজার** প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালালেন। শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রীরা পরাজিত হলেন। এখন সাম্রাজ্যের সর্বময়

কর্তৃত্ব নিয়ে মার্ক অ্যান্টনি ও অক্টাভিয়াস সীজারের মধ্যে যুদ্ধ চলল। মার্ক অ্যান্টনি পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করলেন। অক্টাভিয়াস সীজার হলেন রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তিনি নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা করলেন না। তিনি **প্রিন্সেপ** (প্রধান নাগরিক) এবং **ইম্‌প্যারেটর** (অধিনায়ক) আখ্যা নিলেন। তিনি **অগাস্টাস** (মহামহিমান্বিত) উপাধিতে ভূষিত হলেন। পরিচিত হলেন **অগাস্টাস সীজার** নামে। কিন্তু আসলে তিনি হলেন সম্রাট।

জুলিয়াস সীজার, অগাস্টাস সীজার, টাইবারিয়াস সীজার প্রভৃতি পর পর রাজত্ব করায় সীজার শব্দের অর্থ দাঁড়ালো সম্রাট।

নতুন সাম্রাজ্য : রোম এখন সম্রাট-শাসিত সাম্রাজ্য হয়ে উঠল। অগাস্টাস সীজার ৪১ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই এখন থেকে পরবর্তী দু'শ বছরকে **রোমান শান্তির যুগ** বলা হয়েছে। সম্রাট **ট্রাজান** ও **হাড্রিয়ানের** সময়ে রোম সাম্রাজ্য আরো বিস্তার লাভ করেছিল। রোম সাম্রাজ্য পূর্বে ইউফ্রেতিস নদী থেকে পশ্চিমে ইংলণ্ড এবং দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি থেকে উত্তরে রাইন ও দানিয়ুব নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রোম সাম্রাজ্যে সুদীর্ঘকাল শান্তি বিরাজ করায় এবং রোম অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ায় এই যুগে শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসামান্য উন্নতি হয়েছিল।

৬. রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

সব সময় রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটরা উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন পেতেন না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের লোকেই সম্রাট হতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৈন্যবাহিনী বা প্রাসাদরক্ষী বাহিনী তাঁদের সিংহাসনে বসাতো। সম্রাটরা প্রায়ই তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়তেন। দেশের এক শ্রেণীর মানুষ যেমন বিলাসব্যসনে মত্ত ছিল, তেমনি এক শ্রেণীর লোকের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। **গথ, ভ্যান্ডাল** প্রভৃতি জাতির লোকরাও উৎপাত শুরু করেছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র সর্বদা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাও কঠিন হয়ে উঠেছিল।

এইসব সমস্যা সমাধানের জন্যে সম্রাট **কন্‌স্টান্‌টাইন** সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে কৃষ্ণসাগরে বস্‌ফোরাস প্রণালীর কাছে প্রাচীন **বাইজান্‌টিয়াম** শহরে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর নাম অনুসারে এর নাম হয় **কন্‌স্টান্‌টিনোপল**। কনস্টান্‌টাইনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে রোম সাম্রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিম অংশের রাজধানী থাকে রোম, পূর্ব অংশের রাজধানী হয় কন্‌স্টান্‌টিনোপল। এইভাবে রোম সাম্রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয় ও ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই দুর্বলতার সুযোগে গথ, ফ্রাঙ্ক, ভ্যান্ডাল, টিউটন, হূণ প্রভৃতি জাতির লোকেরা রোম সাম্রাজ্যে ক্রমাগত আক্রমণ, লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংস চালায়। ৪৭৬

খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতন ঘটে। রোমের পতনের পর রোমান সম্রাটরা সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে কন্‌স্টান্‌টিনোপলে রাজত্ব করতে থাকেন। অবশ্য, রোম সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন অবলুপ্ত হ'তে আরো হাজার বছর সময় লাগে।

৭. খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান

যিশুর জন্ম ঃ রোমের শাসন-কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান। ইহুদীদের বাসভূমি **জুডিয়া** ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন। সম্রাট অগাস্টাস সীজারের রাজত্বকালে এখানে **জেরুসালেম** শহরের কাছে **বেথ্‌লেহেমে** এক দরিদ্র ইহুদী পরিবারে যিশুর জন্ম হয়। যিশুর বাবার নাম **জোসেফ,** মার নাম মেরী। যিশু পরে খ্রীষ্ট বা ত্রাণকর্তা নামে পরিচিত হন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তার নবধর্ম প্রচার শুরু করেন। ঐ ধর্ম **খ্রীষ্টধর্ম** নামে পরিচিত।

যিশুর ধর্ম ঃ ইহুদীদের দেবতা ছিলেন **জিহোভা**। তিনি ইহুদীদের পরিত্রাতা ও দুষ্কৃতকারীর দণ্ডদাতা। কিন্তু যিশু বললেন, ঈশ্বর সকলেরই পরিত্রাতা, সকলেরই মঙ্গলময় পিতা। তিনি সকলের পিতা, তাই সকল মানুষ ভাই-ভাই। ক্ষমা, প্রেম, দীনতা, সাম্য ও অহিংসাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। ক্ষমা, প্রেম, দীনতা, সাম্য ও অহিংসার ভিত্তিতেই পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বললেন, অপরাধকে ঘৃণা কর, অপরাধীকে ঘৃণা ক'রো না ; সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ যেমন অসম্ভব, স্বর্গরাজ্যে ধনীর প্রবেশ তেমনি অসম্ভব ; যে শ্রমিক সবচেয়ে আগে কাজে লেগেছে এবং যে শ্রমিক সবচেয়ে শেষে কাজে লেগেছে, তাদের সকলেরই মজুরী সমান। তোমার এক গালে কেউ চড় মারলে তাকে অপর গালটি পেতে দাও। তোমার গামছা কেউ চুরি করলে তাকে তোমার কম্বলটি দাও।

যিশুর এইসব বাণী ছিল যুগান্তকারী—ইহুদী জাতির বিশ্বাস ও স্বার্থের পরিপন্থী। তাই ইহুদীরা রোমান শাসনকর্তার কাছে যিশুর নামে অভিযোগ আনল। যিশু "ভগবানের রাজ্য" প্রতিষ্ঠার কথা বলায় তাঁকে রাজদ্রোহের অপরাধেও অভিযুক্ত করা হ'ল।

বিচারে যিশুর প্রাণদণ্ড হ'ল এবং তাঁকে জেরুসালেমের **ক্যালভারি** পাহাড়ে দুই চোরের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে মারা হ'ল। তাঁর মহান্ জীবন ও মৃত্যু দলে দলে মানুষকে তাঁর ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট করল। তাঁর জীবনকথা ও ধর্মমত **বাইবেল** গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা **খ্রীষ্টান** নামে পরিচিত হলেন।

খ্রীষ্টধর্মের স্বীকৃতি লাভ ঃ রোম সাম্রাজ্যে বহু ধর্মমতের লোক বাস করায় ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতা ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করায় রোম সম্রাটরা তার বিরোধিতা করতে লাগলেন। খ্রীষ্টানদের ওপর অশেষ নির্যাতন চালানো হ'ল ; দলে দলে তাদের পুড়িয়ে এবং

হিংস্র জানোয়ারের মুখে ফেলে হত্যা করা হ'ল। যিশুর প্রধান শিষ্য সেণ্ট পিটার ও **সেণ্ট পল** রোমে শহীদ হলেন। কিন্তু এতেও খ্রীষ্টধর্ম রোধ করা গেল না। অনেক বিশিষ্ট রোমান নাগরিক খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। শেষে সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন নিজে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। খ্রীষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি পেল।

অনুশীলনী

১। রোম কোন্ দেশে অবস্থিত? রোমে কারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল? কবে রোম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা হয়? কে রোম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলা হয়?

২। 'টারকুইন' কাদের বলা হত? এরা কোন্ জাতির লোক ছিল? রোমানদের সঙ্গে এই জাতির লোকদের সম্পর্ক কেমন ছিল? কিভাবে এরা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েছিল?

৩। রোম কিভাবে সারা ইতালিতে অধিকার বিস্তার করেছিল?

৪। কার্থেজ কোথায় অবস্থিত? কার্থেজে কারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল? কার্থেজের সঙ্গে রোমের বিবাদ কেন বেধেছিল?

৫। পিউনিক শব্দের অর্থ কি? পিউনিক যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল? কয়বার পিউনিক যুদ্ধ হয়েছিল? কোন্ যুদ্ধ কতদিন হয়েছিল? এর ফলাফল কি হয়েছিল?

৬। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ কেন হয়েছিল? ফলাফল কি হয়েছিল?

৭। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ কেন হয়েছিল? ফলাফল কি হয়েছিল?

৮। তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ কেন হয়েছিল? ফলাফল কি হয়েছিল?

৯। গোড়ার দিকের রোমান সমাজ সম্পর্কে যা জান লিখ।

১০। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান কাদের বলা হয়? এদের মধ্যে বিবাদের কারণ কি? প্লেবিয়ানরা তাদের অধিকারগুলি কিভাবে আদায় করত? তারা কি কি অধিকার আদায় করেছিল?

১১। রোমান নাগরিকত্ব সম্বন্ধে কি জান?

১২। রোমে ক্রীতদাসের অবস্থা কেমন ছিল? ক্রীতদাস বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? এই বিদ্রোহ কিভাবে ঘটেছিল এবং ফল কি হয়েছিল?

১৩। স্পার্টাকাস কে? তাঁর বিদ্রোহ সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৪। জুলিয়াস সীজার কিভাবে রোম সাম্রাজ্যের একাধিনায়ক হয়েছিলেন? প্রজাতন্ত্রীরা তাঁকে কেন হত্যা করেছিল? এর ফলাফল কি হয়েছিল?

১৫। অগাস্টাস সীজার কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৬। কিভাবে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল?

১৭। খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৮। যিশুখ্রীষ্ট কি বাণী প্রচার করেছিলেন? তাঁর জীবন সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৯। টীকা লিখঃ হানিবল; প্রথম পিউনিক যুদ্ধ; দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ; তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ; জুলিয়াস সীজার; পম্পি; ক্র্যাসাস; স্পার্টাকাস; ব্রুটাস; অগাস্টাস সীজার; মার্ক অ্যাণ্টনি; কন্‌স্টান্‌টাইন; যিশুখ্রীষ্ট; কনস্টান্‌টিনোপল।

২০। শূন্যস্থান পূরণ করঃ

(ক) —— নদীর তীরে —— পর্বতের ওপরে রোম নগরী অবস্থিত। —— খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা হয়। কিংবদন্তীতে আছে, —— রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন।

(খ) রোমের এট্রাস্‌কান-জাতীয় রাজাদের বলা হয় ——। এদের বিতাড়িত ক'রে রোমানরা রোমে —— প্রতিষ্ঠা করে। রোমের অভিজাতদের বলা হ'ত ——, আর সাধারণ নাগরিককে বলা

হ'ত ——। রোমে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নির্বাচিত দুজন —— থাকতেন। সংকটকালে ছ মাসের জন্য সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একজন —— নির্বাচিত হতেন।

(গ) রোমানদের দেবরাজ ছিলেন ——; যুদ্ধের দেবতা ——; কলাশিল্পের দেবী ——; প্রেমের দেবী ——।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। রোম নগর কোন্ পাহাড়ে ও কোন্ নদী-তীরে অবস্থিত ছিল ?
২। কে রোম নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলা হয় ?
৩। কার নাম অনুসারে রোমের নামকরণ হয়েছিল ?
৪। রোম নগর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা হয় ?
৫। রোমান দেবরাজের নাম কি ?
৬। কার্থেজ কোথায় অবস্থিত ?
৭। পিউনিক শব্দের অর্থ কি ?
৮। কাদের প্যাট্রিসিয়ান বলা হ'ত ?
৯। কাদের প্লেবিয়ান বলা হ'ত ?
১০। অক্‌টাভিয়াস সীজার জুলিয়াস সীজারের কে ছিলেন ?
১১। স্পার্টাকাস কিজন্য বিখ্যাত হয়েছেন ?
১২। স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ কোন্ সেনাপতি দমন করেছিলেন ?
১৩। যিশুকে খ্রীষ্ট বলা হয় কেন ?
১৪। কনস্টান্‌টিনোপলে কে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ?
১৫। কোন্ রোম সম্রাট প্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ?
১৬। কনস্টান্টিনোপলের পূর্বনাম কি ছিল ?

নবম পরিচ্ছেদ

চীন

১. শাং ও চৌ শাসন—বিশৃঙ্খলার যুগ—কনফুসিয়াস

শাং ও চৌ শাসন ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে চীনদেশে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। প্রাচীন চীনা দলিল থেকে জানা যায়, গোড়ার দিকে পাঁচজন সম্রাট চীনদেশে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের পরে কয়েকটি রাজবংশ চীনে পর পর রাজত্ব করে। তবে ঐসব রাজবংশ সারা চীনে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ থেকে ১১২৫ অব্দ পর্যন্ত সারা চীনে **শাং রাজবংশ** রাজত্ব করেছিলেন বলা হয়। শাং বংশের শেষ সম্রাট খুব নিষ্ঠুর ও নির্বোধ ছিলেন। তিনি চৌ-বংশীয় রাজার কাছে পরাজিত হয়ে নিজ প্রাসাদে আত্মহত্যা করেন। এর

পরে চৌ-বংশীয় সম্রাটরা চীনদেশে রাজত্ব করতে থাকেন। তবে প্রকৃত সম্রাট বলতে যা বোঝায় শাং ও চৌ-বংশীয় সম্রাটরা সম্ভবত তা ছিলেন না। সম্ভবত তাঁদের অধিকার প্রধান পুরোহিতের কাজেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিশৃঙ্খলার যুগ ঃ খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে চৌ-বংশ হীনবল হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্যে চীনদেশে পাঁচ-ছ হাজার ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়। আর ঐসব ছোট রাজ্যের ওপর দশ-বারোটি বড় রাজ্য আধিপত্য করত। এইসব রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। দেশে শান্তি ছিল না। বড় বড় রাজারা নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে সন্ধি ক'রে দেশে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সে চেষ্টা সব সময় সফল হ'ত না।

তাই দেশ থেকে কিভাবে এই অশান্তি দূর করা যায়, তা-ই ছিল সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রধান চিন্তা। এইসব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন **কুং ফুৎসে** বা **কনফুসিয়াস**।

কনফুসিয়াস ঃ এখানকার শান্‌তুং প্রদেশের লু-রাজ্যে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১ অব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে কন্‌ফুসিয়াসের জন্ম হয়। তিনি তরুণ বয়স থেকে লু-রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী বিভাগে কাজ করেন। তাঁর কর্ম-দক্ষতা দেখে লু-রাজ তাঁকে লু-রাজ্যের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন।

কনফুসিয়াস

ঐ সময়ে সারা চীনদেশে যে অশান্তি, অরাজকতা ও দুর্নীতি চলছিল, তার হাত থেকে কিভাবে দেশকে বাঁচানো যায়, তা-ই ছিল কন্‌ফুসিয়াসের চিন্তা। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, আদর্শ চরিত্র গঠনের দ্বারাই তা সম্ভব। অনুশীলনের দ্বারা মানুষের সৎ গুণগুলি পরিপূর্ণরূপে বিকাশ পেতে পারে। এজন্যে কতকগুলি রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চলা চাই। এইসব রীতিনীতি মেনে চলার দ্বারাই আদর্শ প্রজা, আদর্শ রাজা ও আদর্শ রাষ্ট্র গঠিত হবে।

তিনি যখন লু-রাজ্যের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তখন পার্শ্ববর্তী এক রাজ্যের রাজা লু-রাজের কাছে কয়েকজন নর্তকী উপহার পাঠান। লু-রাজ ঐ নর্তকীদের নিয়ে তিন দিন আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন এবং রাজকার্যে অবহেলা করেন। রাজা এইভাবে রাজোচিত রীতিনীতি লঙ্ঘন করায় কন্‌ফুসিয়াস প্রধান বিচারপতির পদ ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স তিপ্পান্ন। পরবর্তী চোদ্দ বছর তিনি তাঁর আদর্শগুলি কার্যকর করবেন এমন একজন রাজার সন্ধানে সারা দেশে ঘুরে বেড়ান। ঐরূপ কোন রাজার সন্ধান না পেয়ে অবশেষে তিনি লু-রাজ্যেই ফিরে আসেন এবং আদর্শ রীতিনীতি শিক্ষাদানের জন্যে একটি শিক্ষালয় স্থাপন করেন। এই শিক্ষালয়ে প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর মতবাদ ও আদর্শ সারা চীনদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ধর্মের মর্যাদা পায়।

২. চিন্ সাম্রাজ্য—চীনের মহাপ্রাচীর

শি হুয়াংতি : খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম চীনে **চিন্** রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই বংশের চতুর্থ রাজা ওয়াং চেং দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী গঠন ক'রে সারা চীনে আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি **শি হুয়াংতি** বা **প্রথম সম্রাট** উপাধি গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই ছিলেন চীনের প্রথম সম্রাট।

শি হুয়াংতি চীনের ছোট-বড় সমস্ত রাজ্যকে পদানত ক'রে সেগুলিকে ছত্রিশটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকার্যের জন্যে বেতনভোগী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শি হুয়াংতি সারাদেশে পথঘাট, সেচ প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা করেন।
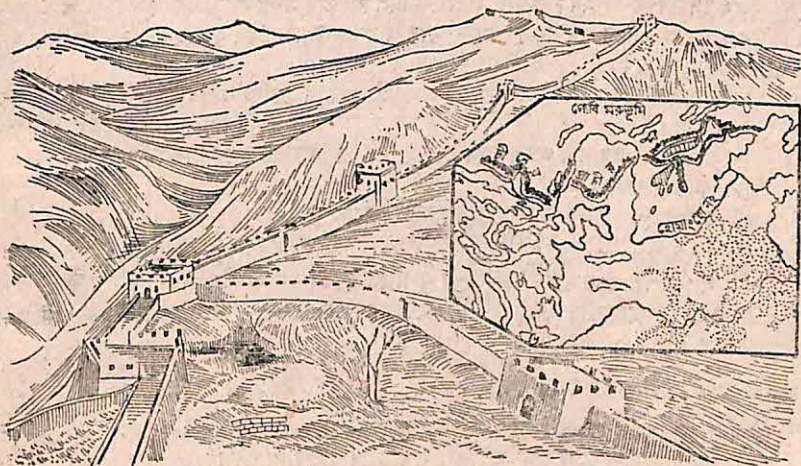
চীনের মহাপ্রাচীর

চীনের মহাপ্রাচীর : ঐ সময়ে উত্তর দিক থেকে প্রায়ই **তাতার** ও **হূণ** জাতীয় লোকেরা চীনে এসে হানা দিত এবং চীনাদের ধন-সম্পদ, শস্য, পশু প্রভৃতি লুঠ

ক'রে নিয়ে যেত। এর স্থায়ী প্রতিকারের জন্যে শি হুয়াংতি চীনের উত্তর সীমান্তে পূর্বে সমুদ্র থেকে পশ্চিমে গোবি মরুভূমি পর্যন্ত একটি বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করেন। এই প্রাচীরের দৈর্ঘ্য দু হাজার মাইলেরও বেশি। প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ১৫ থেকে ২০ ফুট। প্রাচীরটি এতই প্রশস্ত ছিল যে, তার ওপর সামান্য ব্যবধানে পর পর প্রহরারত সৈনিকদের থাকার জন্য প্রায় তিন হাজার মিনার ও গৃহ ছিল। এক-একটি গৃহে শতাধিক সৈনিক থাকতে পারত। এই প্রাচীর **চীনের মহাপ্রাচীর** নামে পরিচিত।

চিন্ সাম্রাজ্যের পতন ঃ এই প্রাচীর নির্মাণের জন্যে আঠারো বছর ধ'রে অসংখ্য শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়েছিল এবং বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছিল। এই বিপুল অর্থ ও শ্রমিক সংগ্রহের জন্যে সম্ভবত শি হুয়াংতিকে কঠোর ব্যবস্থাও নিতে হয়েছিল। ফলে দেশে অসন্তোষ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল। দেশের অনেক পণ্ডিত শি হুয়াংতি-র সমালোচনা করেছিলেন। শি হুয়াংতি এতে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রায় চার শ পণ্ডিতকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং রাজনীতির গন্ধ আছে এমন সব ইতিহাস ও দর্শনের বই নিষিদ্ধ করে পুড়িয়ে ফেলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০২ অব্দের কাছাকাছি সময়ে শি হুয়াংতির মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর চার বছরের মধ্যেই চিন্ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

অনুশীলনী

১। চীনে বিশৃঙ্খলার যুগ বলতে কি বোঝ?
২। কন্‌ফুসিয়াস কে ছিলেন? তাঁর বাণী কি ছিল? তাঁর সম্পর্কে কি জান?
৩। শি হুয়াংতি শব্দের অর্থ কি? কোন্ বংশীয় রাজা ঐ নাম গ্রহণ করেছিলেন? তাঁর প্রকৃত নাম কি? তাঁর ক্ষেত্রে ঐ নাম কি সার্থক হয়েছিল? কেন হয়েছিল?
৪। চীনের মহাপ্রাচীর কে তৈরি করেছিল? কেন এই প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল? এই প্রাচীর সম্পর্কে যা জান লিখ।
৫। চীনে কে রাজনীতির গন্ধ আছে এমন সব বই পুড়িয়ে দিয়েছিলেন? কেন দিয়েছিলেন?
৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
(ক) চীনের —— রাজ্যে কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন।
(খ) শি হুয়াংতি দ্রুতগামী —— বাহিনীর দ্বারা বহু রাজ্য জয় করেছিলেন।
(গ) শাং-বংশীয় শেষ সম্রাট —— হস্তে পরাজিত হয়ে —— করেছিলেন।
(ঘ) চীনের মহাপ্রাচীর চীনের —— সীমান্তে পূর্বে —— থেকে পশ্চিমে —— মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সংক্ষিপ্ত ও মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। কেন কনফুসিয়াস প্রধান বিচারপতির পদ ত্যাগ করেছিলেন?
২। চিন্ রাজবংশের পূর্বে কোন্ দুই রাজবংশ চীনে রাজত্ব করেছিল?
৩। শি হুয়াংতি শব্দের অর্থ কি?
৪। কে শি হুয়াংতি নাম গ্রহণ করেছিলেন?
৫। কোন্ চীনা সম্রাট চীনের প্রাচীর তৈরি করেছিলেন?

ভারত

১. আর্যদের আগমন

আর্য জাতি ঃ মধ্য-এশিয়া বা পূর্ব-ইউরোপে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল। এরা ছিল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও উন্নতনাসা। এরা প্রধানত পশুপালক ও যাযাবর ছিল। আবহাওয়া, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব প্রভৃতি নানা কারণে এরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদেরই একটি শাখা সম্ভবত পারস্য ও আফগানিস্থানের পথে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

ভারতে বসতি স্থাপন ঃ আর্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করে, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা বিরাজ করছিল। আর্যরা ঘোড়া ও লোহার ব্যবহার জানত। অশ্ব ও লৌহাস্ত্রের ব্যবহার জানায় তারা সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের পরাজিত ক'রে ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। দ্রাবিড় জাতির লোকেরাই সিন্ধু সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল বলা হয়। দ্রাবিড় ও অন্যান্য জাতির লোকদের পরাজিত ও বিতাড়িত ক'রে আর্যরা ক্রমেই পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এখান থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল মনে হয়।

২. বেদ

চতুর্বেদ ঃ আর্যরা যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল, সেই সময়েই তারা পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র **বেদ** রচনা শুরু করেন। 'বেদ' মানে জ্ঞান। বেদ চার ভাগে বিভক্ত—**ঋক্‌, সাম্‌, যজুঃ** ও **অথর্ব**।

বেদের চার অংশ ঃ প্রত্যেক বেদ আবার **সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক** ও **উপনিষদে** বিভক্ত। সংহিতায় দেবতাদের স্তবস্তুতি ও মন্ত্রাদি আছে। এগুলিকে সূক্ত বলা হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতাই বেদের প্রাচীনতম অংশ। সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদের বেশির ভাগ সূক্তই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। সামবেদ-সংহিতার সূক্তগুলি যাগযজ্ঞের সময়ে গাওয়া হ'ত। যজুর্বেদ-সংহিতায় সুন্দর ছন্দোময় গদ্যও আছে। অথর্ববেদ-সংহিতায় আছে স্তব ছাড়া মন্ত্রতন্ত্র ও ডাকিনীবিদ্যা।

ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত। এগুলিতে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া-কাণ্ডের বিবরণ আছে। সকল বেদেরই ব্রাহ্মণ আছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের শেষে আছে আরণ্যক। সংসারত্যাগী

অরণ্যবাসী আর্যদের জন্যে এই অংশ রচিত। বেদের শেষ অংশ **উপনিষদ্** বা **বেদান্ত**। এগুলিতে আত্মা, সত্য, সৃষ্টি, ব্রহ্ম ইত্যাদির আলোচনা আছে।

৩. গোড়ার দিকে আর্যদের সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক সংগঠন

সমাজ ঃ প্রাচীন আর্য সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল পরিবার। বাবা ছিলেন পরিবারের কর্তা। মা বাবার অধীন হ'লেও তাঁর সম্মান কম ছিল না এবং স্ত্রীলোকরা সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে চিরকুমারী থাকতে ও লেখাপড়া শিখতে পারতেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিখ্যাতা বিদুষীরা প্রাচীন আর্য সমাজেই জন্মেছিলেন। বিধবা-বিবাহও প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন আর্য সমাজ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এইরূপ বিভাগকে বলা হয় **বর্ণভেদ**। আর্যরা গৌরবর্ণ এবং অনার্যরা কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় তাদের মধ্যে পার্থক্য রাখার জন্যে গোড়াতে বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পরে আর্য সমাজে গুণ ও কর্ম অনুসারে **ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য** ও **শূদ্র**—এই চার বর্ণের সৃষ্টি হয়। যাঁরা দেবার্চনা ও বিদ্যাচর্চা নিয়ে থাকতেন, তাঁরা ব্রাহ্মণ। যাঁরা দেশশাসন, দেশরক্ষা ও যুদ্ধে নিযুক্ত থাকতেন, তাঁরা ক্ষত্রিয়। যাঁরা কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, তাঁরা বৈশ্য। যেসব অনার্য আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করায় সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান পেয়েছিল, তারা **শূদ্র**।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন উচ্চবর্ণের আর্যদের জীবনকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এই ভাগগুলির এক-একটিকে বলে **আশ্রম**। আর্যরা বাল্যে গুরুগৃহে থেকে সংযম ও শুচিতার মধ্যে শিক্ষা লাভ করতেন। এই সময়টির নাম **ব্রহ্মচর্য**। শিক্ষা-শেষে তাঁরা বিয়ে ক'রে সংসারী হতেন। এই সময়টির নাম **গার্হস্থ্য**। পরে প্রৌঢ় বয়সে তাঁরা সংসার ছেড়ে বনে প্রস্থান করতেন। এই সময়টার নাম **বানপ্রস্থ**। শেষে বয়সে তাঁরা সন্ন্যাসী হতেন। এর নাম **সন্ন্যাস** বা **যতি**।

ধর্ম ঃ গোড়ার দিকে ভারতীয় আর্যরা অন্যান্য আর্য উপজাতির মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পুজো করত। দ্যৌ (আকাশ), মিত্র (সূর্য), বরুণ, ইন্দ্র, পৃথিবী, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতি ছিলেন তাদের দেবতা। তারা এই সকল দেবতাকে স্তব-স্তুতি, যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতির দ্বারা তুষ্ট করত। পরে উপনিষদ রচনার যুগে তারা এক ও নিরাকার ঈশ্বরের কথাও চিন্তা করে। অনার্য সভ্যতার প্রভাবে নতুন নতুন দেবদেবীর কল্পনাও করা হয়।

রাজনৈতিক সংগঠন ঃ কতকগুলো পরিবার নিয়ে হ'ত **গ্রাম**। গ্রাম শাসন করতেন **গ্রামণী**। কতকগুলো গ্রাম নিয়ে হ'ত **বিশ্** বা **জন**। বিশ্ বা জনের শাসককে বলা হ'ত **বিশ্পতি** বা **রাজন্** (রাজা)। দেশে রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। তবে রাজারা জনসাধারণের মত মেনে চলতেন। তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার

জন্যে **সভা** ও **সমিতি** থাকে। রাজার প্রধান মন্ত্রীকে বলা হ'ত **পুরোহিত**। রাজারা শক্তিশালী হয়ে তাঁদের অধিকার বিস্তার করতেন এবং একরাট্, সম্রাট প্রভৃতি হতেন। তাঁরা তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য ঘোষণার জন্যে রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করতেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রও প্রচলিত ছিল। প্রজাতন্ত্রে গণজ্যেষ্ঠরা রাজ্য শাসন করতেন।

৪. মহাকাব্য

আর্যরা যখন ভারতে বসতি বিস্তার করছিল, তখন তাদের একদিকে যেমন অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের মধ্যেও বহু যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এইসব ঘটনা নিয়ে কবিরা কবিতা ও গান রচনা করতেন। কোন প্রতাপশালী রাজা যাগযজ্ঞ করলে তখন তাঁরা এগুলি গাইতেন। এইভাবে মহাকাব্য রচনার সূচনা হয়েছিল। সূর্যবংশীয় রাজাদের গৌরব নিয়ে **রামায়ণ** এবং চন্দ্রবংশীয় রাজাদের গৌরব নিয়ে **মহাভারত** মহাকাব্য দুখানি রচিত হয়েছিল। **বাল্মীকিকে** রামায়ণের এবং **ব্যাসদেবকে** মহাভারতের রচয়িতা বলা হয়।

অনার্যরা আর্যদের কাছে পরাজিত হলেও সভ্যতায় আর্যদের চেয়ে কম উন্নত ছিল না। ফলে প্রাচীন আর্য সভ্যতায় অনার্য সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল এবং আর্য সমাজে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। মহাকাব্যের যুগে অনার্যদেবতা শিব মহেশ্বররূপে অন্যতম প্রধান দেবতার আসন পেয়েছিলেন। বৈদিক যুগে যে ইন্দ্র প্রধান দেবতা ছিলেন, মহাকাব্যের যুগে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। দেবতাদের মধ্যে বহু পৌরাণিক দেবদেবী স্থান পেয়েছিলেন।

রামায়ণে আর্যদের দক্ষিণ ভারতে অধিকার বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। মহাভারতে দেখা যায়, উত্তর ভারতের একটি রাজবংশ সমস্ত ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করছে। এইভাবে মহাকাব্যগুলিতে একটি আর্য-শাসিত ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথা বলা হয়েছে।

মহাকাব্যের যুগে আর্যসমাজে বর্ণভেদের কঠোরতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল। রাজা শান্তনু ধীবরকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং পরশুরাম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এই যুগেই ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র ও ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ দেবতার আসন লাভ করেছিলেন। সমাজে ব্রাহ্মণদের তুলনায় ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা বেড়েছিল।

৫. জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান

বলিদান ও যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের ঘৃণার চক্ষে দেখছিলেন। কিন্তু জীবহিংসা

ও মানুষের প্রতি ঘৃণাকে সকলে ধর্ম ব'লে মেনে নিতে পারছিলেন না। উপনিষদে ঋষিরা **কর্ম** ও **জন্মান্তরের** কথাও বলেছিলেন। বলেছিলেন, জীব বার বার জন্মে, কর্ম অনুসারে তাদের অধোগতি বা ঊর্ধ্বগতি হয়। ফলে যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড ও বলিদান প্রভৃতিতে পূর্ণ হিন্দুধর্মের প্রতি মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিল। হিন্দুধর্মের বিরোধী বহু ধর্মমত দেখা দিল। সেগুলির মধ্যে **জৈনধর্ম** ও **বৌদ্ধধর্ম** প্রধান।

জৈনধর্ম ঃ মহাবীর জৈনধর্ম প্রচার করেন। মহাবীরের প্রকৃত নাম **বর্ধমান**। তিনি বৈশালীর কাছে **কুণ্ডপুরে** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম **সিদ্ধার্থ** ও মার নাম **ত্রিশলা**। **সিদ্ধার্থ জ্ঞাতৃক** নামে এক ক্ষত্রিয়কুলের নেতা ছিলেন এবং **ত্রিশলা** ছিলেন লিচ্ছবিরাজকন্যা। অল্পবয়সে **যশোদা** নামে এক কন্যার সঙ্গে বর্ধমানের বিবাহ হয়। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হন এবং বারো বছর পর্যটন ও তপশ্চর্য করেন। তিনি কঠোর সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় **মহাবীর** ও **জীন** (জয়ী)। 'জিন' শব্দ থেকে তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হয়েছিল **জৈনধর্ম**।

মহাবীর

ব্রহ্মচর্য, সত্যবাদিতা, চুরি না করা এবং ত্যাগ এই হ'ল জৈনধর্মের মূলকথা। জন্ম ও কর্মস্থলের হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে এইগুলি কঠোরভাবে পালন করা দরকার। বসন-ভূষণকেও মহাবীর বন্ধন ব'লে মনে করতেন। তাই তিনি বসন-ভূষণ ত্যাগ ক'রে উলঙ্গ থাকতে বলেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই ; প্রত্যেক বস্তুরই আত্মা আছে ; মানবাত্মার পূর্ণতম বিকাশই ঈশ্বর ; জীবহিংসা মহাপাপ।

মহাবীর ত্রিশ বৎসর মগধ, কোশল, মিথিলা, অঙ্গ প্রভৃতি নানা স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। ৭২ বছর বয়সে পাটনা জেলার **পাবা** নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

গোড়ার দিকে জৈন্যধর্ম দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। তবে জৈনধর্ম ভারতের বাইরে কখনো বিস্তার লাভ করেনি। পরে জৈনরা **দিগম্বর** (উলঙ্গ) ও **শ্বেতাম্বর** (শ্বেতবস্ত্র-পরিধানকারী) নামে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। দেশে বৌদ্ধধর্মের

জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমেই জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়। এখনও গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রচলিত আছে।

বৌদ্ধধর্মঃ বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন **বুদ্ধদেব**। তিনি মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধের প্রকৃত নাম **সিদ্ধার্থ গৌতম**। বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলে প্রাচীনকালে **কপিলাবস্তু** নামে এক রাজ্য ছিল। কপিলাবস্তুতে শাক্য নামে একটি ক্ষত্রিয়কুলের নেতা ছিলেন **শুদ্ধোদন**। **লুম্বিনী** নামক স্থানে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় শুদ্ধোদনের পত্নী **মায়াদেবীর** গর্ভে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থের জন্মের অলপকাল পরেই মায়াদেবীর মৃত্যু হ'লে সিদ্ধার্থ তাঁর বিমাতা ও মাসী **মহাপ্রজাপতি গৌতমীর** কাছে পালিত হন। সিদ্ধার্থ বাল্যকালেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। প্রথম যৌবনেই **গোপা** বা **যশোধরা** নামে এক আত্মীয়-কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সিদ্ধার্থ আশৈশব রাজসুখে লালিত হয়েছিলেন। তবু ক্রমেই সংসারের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য জন্মে। মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতির কথা চিন্তা ক'রে তিনি ব্যাকুল হন। অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করেন। এই সময়ে তাঁর এক পুত্র জন্মে। তিনি পুত্রের নাম রাখেন **রাহুল** (বাধা)। সংসারের বন্ধন ক্রমেই বাড়ছে দেখে তিনি ঊনত্রিশ বছর বয়সে একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করেন ও সন্ন্যাসী হন। তারপর তিনি নানা স্থান পর্যটন ও তপস্যা করেন। অবশেষে ৩৫ বছর বয়সে তিনি গয়ার কাছে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব নামক স্থানে এক বটবৃক্ষতলে **বোধি** বা পরম জ্ঞান লাভ করেন। বোধি লাভ করায় তাঁর নাম হয় **বুদ্ধ**। তিনি যে স্থানে তপস্যা করেছিলেন তার নাম হয় **বোধ-গয়া**। তিনি যে বৃক্ষতলে তপস্যা করেছিলেন তার নাম হয় **বোধিবৃক্ষ** বা **বোধিদ্রুম**।

গৌতম বুদ্ধ

তিনি কাশীর কাছে **সারনাথে** তাঁর বাণী প্রথম প্রচার করেন। বলেন, মানুষ আপন কর্মফলে জন্মলাভ করে এবং জন্মে দুঃখ পায়। দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পেতে হ'লে তাকে জন্মের হাত থেকেও মুক্তি পেতে হবে। জন্মের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার নাম **নির্বাণ**। সৎ কর্মের দ্বারা পর জন্মে মানুষের ঊর্ধ্বগতি হয়। ঊর্ধ্বগতি হ'তে হ'তে এমন এক সময় আসে যখন তার আর জন্ম হয় না, সে জন্ম ও

দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। সৎ জীবন যাপনের দ্বারাই এইরূপ নিষ্কৃতিলাভ বা নির্বাণ সম্ভব। তিনি হিন্দুদের যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, বলিদান প্রভৃতির নিন্দা করেন। তিনি জৈনদের কঠোর সংযম ও আত্মপীড়নেরও নিন্দা করেন। তিনি বর্ণভেদ মানেন না। ভগবান আছেন কি নেই, সে সম্পর্কে তিনি নীরব থাকেন।

তিনি ৪৫ বছর ধরে মগধ (বিহার), কোশল (উত্তরপ্রদেশ) প্রভৃতি নানা স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার **কুশীনগরে** আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম সারা ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম **মহাযান** ও **হীনযান** নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। তা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম প্রায় সারা এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। তবে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রায় লোপ পায়।

৬. মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য

মগধের অভ্যুত্থানঃ মহাবীর ও বুদ্ধের সময়ে ভারতে ষোলটি প্রধান রাজ্য ছিল। এগুলির মধ্যে মগধ ক্রমেই সর্বাধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেবের সময়ে **বিম্বিসার** মগধে রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র **অজাতশত্রুর** সময়ে কোশল, কাশী ও বৃজি রাজ্যগুলি মগধের অধিকারে আসে। অজাতশত্রুর পুত্র বা পৌত্র উদয়ীভদ্র **পাটলিপুত্রে** মগধের রাজধানী স্থাপন করেন।

অজাতশত্রুর পরবর্তী বংশধরদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিছুদিন শিশুনাগ-বংশীয় রাজারা মগধে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা কাকবর্ণীকে হত্যা ক'রে **মহাপদ্ম নন্দ** মগধের রাজা হন এবং **নন্দ** বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপদ্ম নন্দকে জৈন সাহিত্যে বারবিলাসিনীর পুত্র ও গ্রীক ইতিহাসে নাপিত বলা হয়েছে। যাই হোক, মহাপদ্ম নন্দ যে খুবই শক্তিশালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আট পুত্র পর পর রাজা হন। তাঁর শেষ পুত্র **ধন নন্দের** সময়েই গ্রীক বীর আলেক্‌জাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

মৌর্য বংশঃ সম্ভবত ধন নন্দ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। ধন নন্দের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করতে যুবক চন্দ্রগুপ্ত আলেক্‌জাণ্ডারের শিবিরে গিয়েছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডার তাঁকে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করেন। কিন্তু তিনি সুকৌশলে পলায়ন করেন। তাঁর সঙ্গে **বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য** নামে তক্ষশিলাবাসী এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের পরিচয় হয়। চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত ধন নন্দকে পরাজিত ক'রে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন (আঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৪)। চাণক্য তাঁর প্রধান মন্ত্রী হন। কূটবুদ্ধির জন্যে **চাণক্য কৌটিল্য** নামেও পরিচিত।

নন্দ রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত গ্রীক-শাসিত ভারতীয় অঞ্চলও চন্দ্রগুপ্ত জয় করেন। দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র অঞ্চল তাঁর অধিকারভুক্ত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তা **মৌর্য সাম্রাজ্য** এবং তিনি যে রাজবংশ স্থাপন করেন তা **মৌর্য বংশ** নামে পরিচিত। অনেকের মতে, চন্দ্রগুপ্তের মা মুরার নাম অনুসারে এই রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য হয়েছে। তবে এই মত সম্ভবত ঠিক নয়। অনেকের মতে, **মোরীয়** নামে এক ক্ষত্রিয়কুলের রাজকুমার ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। মোরীয় শব্দ থেকেই মৌর্য শব্দের উৎপত্তি।

আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর সেনাপতি সেলুকাস গ্রীক-বিজিত এশিয়ার অধীশ্বর হয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক-শাসিত ভারতীয় অঞ্চল জয় করায় সেলুকাসের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে কে পরাজিত হয়েছিলেন বলা যায় না। তবে সন্ধির শর্ত দেখে মনে হয় চন্দ্রগুপ্তই জয়ী হয়েছিলেন। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে হীরাট, বেলুচিস্থান ও কান্দাহার ছেড়ে দিয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে ৫০০ হাতি দিয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকাসের মধ্যে বিবাহগত সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল।

চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবত ২৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন। জৈন শাস্ত্র অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত শেষ বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং জৈন প্রথা অনুসারে অনাহারে থেকে মহীশূরে **শ্রবণ বেলগোলা** নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ)।

চন্দ্রগুপ্তের পর সম্রাট হন তাঁর পুত্র **বিন্দুসার**। তিনি প্রায় ২৭ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর পুত্র অশোক।

অশোক ঃ পিতার মৃত্যুর পর অশোক তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীমকে হত্যা ক'রে রাজা হন। তিনি নাকি প্রথম জীবনে খুব দুরন্ত ও নিষ্ঠুর ছিলেন। তাই তাঁকে **চণ্ডাশোক** বলা হত। ঐ সময়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মহানদী ও গোদাবরী নদীর মধ্যে **কলিঙ্গ** নামে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। অশোক ঐ রাজ্য জয়ের জন্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত অশোক

মহারাজ অশোক

জয়ী হ'লেও ঐ যুদ্ধে প্রায় এক লাখ সৈন্য নিহত ও দেড় লাখ লোক বন্দী হয়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতেও অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটে। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই মৃত্যু ও দুঃখ-দুর্দশায় অশোক কাতর হন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন।

এখন থেকে অশোক যুদ্ধ ও দেশজয়ের নীতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন। মানুষের ও জীবের কল্যাণসাধনই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে ওঠে। তিনি বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য নানা ব্যবস্থা করেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র কূপ খনন, পথঘাট নির্মাণ ও সেচব্যবস্থা করেন। পথের দুধারে ফল ও ছায়া দানের উপযোগী বৃক্ষ রোপন করেন। তিনি মানুষ ও পশুর জন্যে বহু আরোগ্যশালা স্থাপন করেন এবং দরিদ্র প্রজাদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে দেশে-বিদেশে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পাঠান। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রজাদের চরিত্রগঠনের জন্যে সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্তম্ভগাত্রে ও পর্বতগাত্রে নানা বাণী ক্ষোদিত করে দেন। ঐসব বহু লিপি আজও বর্তমান আছে।

লৌরিয়া-নন্দনগড়ের অশোকস্তম্ভ

অশোকের সময়েই মৌর্য সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি যুদ্ধের পথ ছেড়ে শান্তির পথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি প্রজাদের নিজের সন্তান ব'লে মনে করতেন। অন্য রাজ্যের প্রজাদের সুখ-শান্তির কথাও তিনি চিন্তা করতেন। তাই অনেকে তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলেছেন।
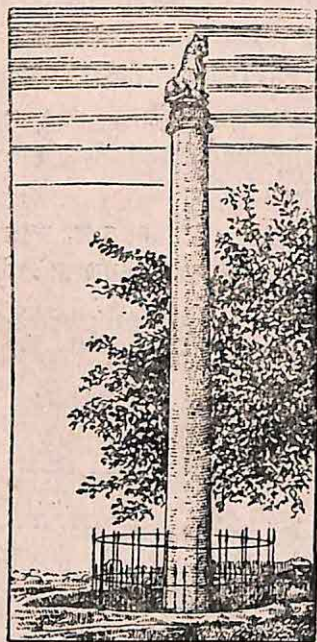
অশোক প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।
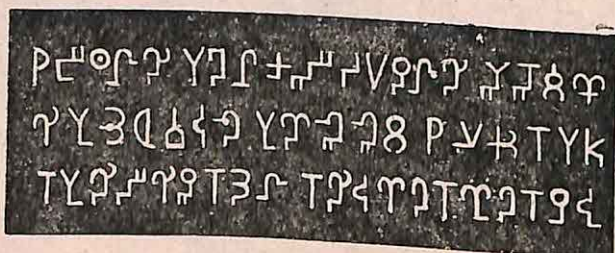
ব্রাহ্মীলিপিতে অশোকের বাণী

সামরিক শক্তির দ্বারাই মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অশোক শান্তি

ও অহিংসার নীতি গ্রহণ করায় মৌর্য সাম্রাজ্য সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। দেশে অনেক ছোট-বড় রাজ্যের উদ্ভব হয়।
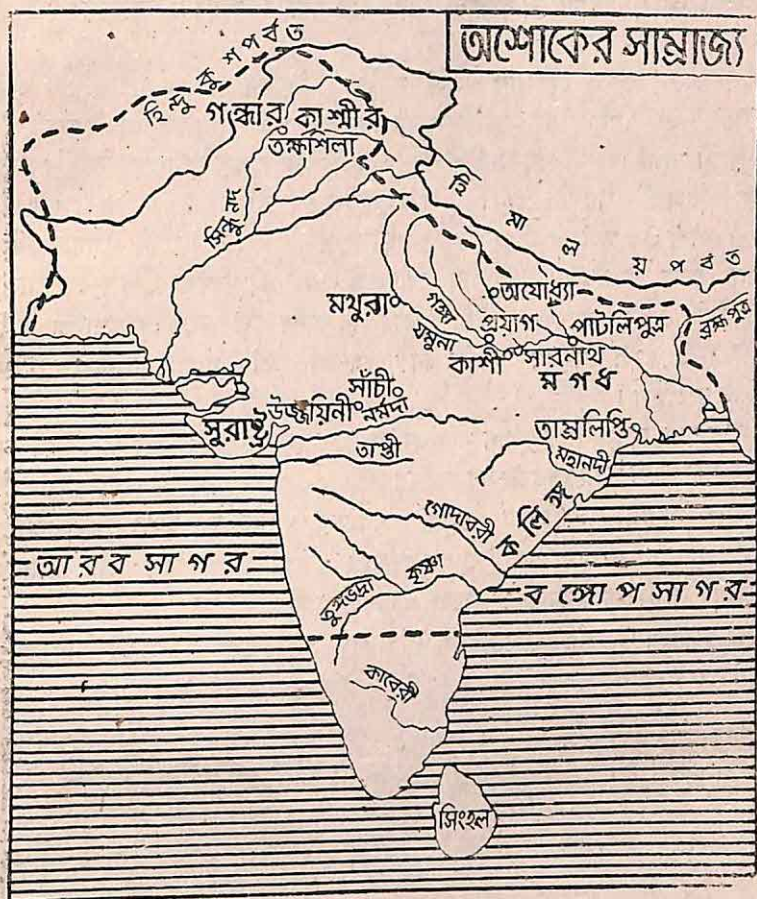
বৈদেশিক আক্রমণ ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের যখন পতন হয়, তখন অনেক বিদেশী জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে **বাহ্লীক-গ্রীক, শক, পহ্লব, ও কুষাণ** প্রধান। সেলুকাস-বংশীয় গ্রীক রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে পার্থিয়ান বা **পহ্লব** এবং আমুদরিয়া নদী ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যবর্তী ব্যাক্‌ট্রিয়ায় **বাহ্লীক-গ্রীকরা** স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। বাহ্লীক-গ্রীকরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিশাল অংশে রাজ্যবিস্তার করে। মধ্য-এশিয়ার সির দরিয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে **শক** জাতির লোকেরা বাস করত। তারাও উত্তর-পশ্চিম ভারতে অধিকার বিস্তার করে। পরে

তারা মধ্য ও দক্ষিণ ভারতেও অধিকার বিস্তার করেছিল। শকদের পেছনে তাড়া ক'রে অগ্রসর হয়েছিল ইউয়ে-চি জাতির লোকেরা। ইউয়ে-চি-দের মধ্যে প্রবলতম ছিল কুষাণরা। এরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্যবিস্তার করে। এইসব বিদেশী জাতি ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরে বিরাট ভারতীয় সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

কণিষ্ক ঃ কুষাণ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন **কণিষ্ক**। কণিষ্ক সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। পূর্বে মধ্য-ভারত থেকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর এবং উত্তরে সির দরিয়া থেকে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর (পেশোয়ার)। তিনি বীর যোদ্ধা হ'লেও বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর সময়েই মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য পাওয়ায় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের মূর্তি নির্মিত হ'তে থাকে। **এইভাবে** ভারতীয় ভাস্কর্য এক নূতন প্রেরণা পায়। তিনি বহু মঠ ও স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর সময়েই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।

কণিষ্কের মৃত্যুর পর কুষাণ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। এর পর প্রায় দু'শ বছর ভারতে কোনও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়নি।

গুপ্ত সাম্রাজ্য ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গুপ্তরাজ **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত** মগধে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী। বিহারের অধিকাংশ, উত্তর-বঙ্গ এবং উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ সম্ভবত তাঁর অধিকারে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **সমুদ্রগুপ্ত** অলপকালের মধ্যে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি উত্তর ভারতের বহু রাজাকে পরাজিত

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

করেন। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ রাজাই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। গুপ্ত রাজারা হিন্দু ছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রাচীন প্রথা অনুসারে দিগ্বিজয়-শেষে

সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধযজ্ঞ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত কেবল বীর ছিলেন না, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে শতদ্রু থেকে পূর্বে ভাগীরথী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** রাজা হন। অনেকে মনে করেন, তিনিই ছিলেন কাহিনী-কিংবদন্তীর **বিক্রমাদিত্য** এবং মহাকবি **কালিদাস** তাঁরই সভাকবি ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের পরাজিত ক'রে মালব অধিকার করেন এবং **শকারি** (শকদের শত্রু) উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মালবের **উজ্জয়িনী**তে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **কুমারগুপ্ত** এবং পৌত্র **স্কন্দগুপ্ত** রাজা হন। স্কন্দগুপ্তের সময়েই **হূণ** জাতির লোকেরা প্রথম ভারত আক্রমণ করে। হূণ জাতির লোকেরা চীনের সীমান্ত দেশে বাস করত। তারা ক্রমেই দক্ষিণে অগ্রসর হ'তে থাকে। তাদের একটি শাখা ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয় এবং **এটিলার** নেতৃত্বে রোম বিধ্বস্ত করে (৪৫১ খ্রীঃ অঃ)। তাদের অন্য একটি শাখা ভারতে প্রবেশ ক'রে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত হূণ আক্রমণ ব্যর্থ করেন (৪৬০ খ্রীঃ অঃ)।

স্কন্দগুপ্তই গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিশালী সম্রাট। তাঁর বংশধরদের অযোগ্যতা, শাসনকর্তা ও অধীন রাজাদের বিদ্রোহ এবং হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

৭. গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গদেশ

প্রাচীন বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে এবং গ্রীক লেখকদের রচনায় বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কথা আছে।

আর্যদের বাংলাদেশে বসতি বিস্তারের আগে অনার্য ও দ্রাবিড় জাতির লোকেরা এখানে বাস করত। আর্যরা এদের অসভ্য ও অশুচি মনে করত। তাই বেদে ঐ যুগের বাংলাদেশের লোকদের 'ব্রাত্য' (অশুচি) ও 'পক্ষিভাষী' বলা হয়েছে।

মহাভারতের গল্প থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে উত্তরবঙ্গে **পুণ্ড্র বাসুদেব** নামে রাজা ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বধ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির যখন যজ্ঞ করেছিলেন, তখন যজ্ঞের ঘোড়া রক্ষার জন্যে ভীমকে **তাম্রলিপ্ত** ও **বঙ্গের** রাজাদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়েছিল। রামায়ণেও বাংলাদেশের অনেক প্রশংসা আছে।

সিংহলে প্রাপ্ত বৌদ্ধগ্রন্থ **মহাবংশে** পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ়) রাজা **সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহের** লঙ্কাজয়ের কথা আছে। বলা হয়েছে, যে বৎসর বুদ্ধদেব মারা যান, সেই বৎসরই বিজয় সিংহ লঙ্কাজয় করেন।

জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাঢ়ের লোকেরা বর্বর ও নিষ্ঠুর ছিল। তারা **মহাবীরকে** প্রহার করেছিল এবং তাঁর ওপর কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কুকুর ঠেকাবার জন্যে তাঁদের লম্বা লাঠি রাখতে হ'ত। তবে একথাও সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গে

একাধিক জৈন সন্ন্যাসী বাস করতেন এবং **সমেত** পাহাড়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। তীর্থংকর **পার্শ্বনাথ** ঐ পাহাড়েই দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর নামেই ঐ পাহাড়ের নাম হয়েছে **পরেশনাথ**।

গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায়, আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে বাংলাদেশে **গঙ্গারিডই** জাতি বাস করত। গ্রীক ভাষায় ভারতীয় নামগুলিকে বিকৃত ক'রে লেখা হ'ত। সম্ভবত গঙ্গার তীরবর্তী রাঢ়ের অধিবাসীদেরই গঙ্গরিডই বলা হয়েছে। একজন গ্রীক লেখক লিখেছেন ঃ "ভারতে বহু জাতির বাস। সেগুলির মধ্যে গঙ্গরিডই জাতিই সর্ব শ্রেষ্ঠ। এদের চার হাজার রণহস্তী আছে ; এজন্যে অন্য কোন রাজা এ দেশ জয় করতে পারেননি। আলেক্‌জাণ্ডারও এইসব রণহস্তীর কথা শুনে এই জাতিকে পরাস্ত করার আশা ত্যাগ করেছিলেন।"

মৌর্য যুগে বাংলাদেশ যে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর, খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেও যে গঙ্গরিডই জাতি খুবই প্রবল ছিল, তা গ্রীক লেখক **টোলেমির** রচনা এবং গ্রীকগ্রন্থ **পেরিপ্লাস** থেকে জানা যায়।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ায় মগধে **গুপ্ত রাজবংশের** প্রতিষ্ঠা হ'লে, বাংলাদেশে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে বাংলাদেশে অনেকগুলি ছোট রাজ্যের উদ্ভব ঘটে।

৮. বৈদেশিক যোগাযোগ

সিন্ধু সভ্যতার যুগের লোকে মেসোপটেমিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য করত। দরায়ুস ও আলেকজাণ্ডার কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত জয়ের ফলে যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি পায়। মৌর্যযুগে পারসিক ও গ্রীক সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে তাতে অনেকে পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। অনেকের মতে, ভারতে দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ গ্রীক প্রভাবেই প্রচলিত হয়েছিল। কুষাণ যুগে গ্রীক শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পকলাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

কুষাণ যুগে রোম সাম্রাজ্য এবং চীনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটেছিল। এই যোগাযোগ গুপ্ত যুগে খুবই বেড়েছিল। তাই রোমান স্বর্ণমুদ্রার নামেই ঐ যুগের ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রার নাম হয়েছিল 'দিনার'। রোম সাম্রাজ্যে ভারতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র, রেশম, পশম, তুলা, লোহা, মসলা, হীরা, মণি-মুক্তা, পান ও হাতির দাঁত বিক্রি হ'ত। অসংখ্য রোমান স্বর্ণমুদ্রা ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গেছে।

শক, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি জাতিগুলি মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিল। তারা ভারতের সভ্যতা ও ধর্মকে গ্রহণ করেছিল এবং ভারতীয় সমাজের সঙ্গে

একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল। ফলে তাদের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রাপদ্ধতি ভারতীয় সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মধ্য-এশিয়ায় প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয়রা ঐসব অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করত, উপনিবেশ ও রাজ্য গড়ে তুলত। খোটান, কাশগড়, কারাশর, ইয়ারকন্দ, নিয়া, ইয়াক-আরিক, তুরফান প্রভৃতি ছিল বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারকেন্দ্র। মধ্য-এশিয়ার নানা স্থানে খনন চালিয়ে ভারতীয় শিল্পকলার অসংখ্য নিদর্শন ও ভারতীয় লিপিতে লেখা বহু পুঁথি পাওয়া গেছে। সেগুলি থেকে বোঝা যায়, প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চীনের সীমান্তে তুন্ হোয়াং গিরিগুহায় যে বুদ্ধমূর্তিগুলি পাওয়া গেছে, তা ঐ অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের জ্বলন্ত প্রমাণ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও প্রাচীনকালে ভারতের যোগাযোগ ছিল। ব্রহ্মদেশ, ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া, সিয়াম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতির সুবিস্তৃত অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। সমুদ্রপথেই ভারত এই এইসব অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা করত। এইসব অঞ্চলে তারা বহু উপনিবেশ ও রাজ্য গড়ে তুলেছিল। কাম্বোডিয়ার বিখ্যাত **বিষ্ণুমন্দির** এবং যবদ্বীপের বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ **বরবুদুর** এখনও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

৯. বৈদেশিক বিবরণ—মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েন

মেগাস্থিনিস ঃ মেগাস্থিনিস ছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সেলুকাসের দূত। তিনি **ইন্ডিকা** নামে একটি বই লিখেছিলেন। তা থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অনেক কথা জানা গেছে।

তিনি লিখেছিলেন, ঐসময় ভারতীয়রা সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ (১) দার্শনিক, (২) কৃষক, (৩) শিকারী ও পশুপালক, (৪) কারিগর ও ব্যবসায়ী, (৫) সৈনিক, (৬) গুপ্তচর ও (৭) অমাত্য। কৃষকের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাদের অবস্থা খারাপ ছিল না। তারা ছিল পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও সংযমী। মেগাস্থিনিস লিখেছেন, ভারতে ক্রীতদাস ছিল না। একথা ঠিক নয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে ক্রীতদাসের সংখ্যা খুব কম ছিল ও তাদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করা হ'ত, তাই তাঁর চোখে ক্রীতদাস-প্রথা ধরা পড়েনি। তিনি ভারতবাসীর চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। লিখেছেন, তারা খুব সরল ও আড়ম্বরহীন ; মিথ্যা কথা বলে না, চুরি-ডাকাতি করে না। ভারতীয়রা খুব শৌখিন ও অলংকার-প্রিয়। মেগাস্থিনিসের লেখা থেকে জানা যায়, রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় শহর। লম্বায় সাড়ে ন' মাইল ও চওড়ায় পৌনে দু' মাইল। চারদিকে প্রশস্ত পরিখা ও উচ্চ প্রাচীর ছিল। প্রাচীরে ছিল ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি চূড়া। শহরের পরিচালন-ভার ছিল ত্রিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পৌর-সভার উপর।

ফা-হিয়েন ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে এসেছিলেন। তিনি মধ্য এশিয়ার পথে ভারতে এসেছিলেন। তিনি প্রায় পনের বছর ভারতে ছিলেন এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে ঘুরেছিলেন। তিনি তিন বছর পাটলিপুত্রে থেকে সংস্কৃত শিখেছিলেন। তিনি ঐ সময়ের ভারত সম্পর্কে একটি বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সিংহল ও যবদ্বীপের পথে জাহাজে ক'রে দেশে ফিরে যান।

তিনি লিখেছেন, ভারতবাসীরা খুবই দানশীল ও অতিথিপরায়ণ ; সকলেই সুখে-শান্তিতে বাস করে। তারা সৎ ও সত্যবাদী। দেশে চুরি-ডাকাতি নেই। অপরাধের দণ্ড কঠোর নয়। কাউকে মৃত্যুদণ্ড বা শারীরিক দণ্ড দেওয়া হয় না। পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ ও মথুরাতে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হ'লেও মধ্যভারতে হিন্দুধর্মই প্রবল। চণ্ডাল ছাড়া অন্য লোকে মাছ-মাংস খায় না।

১০. প্রাচীন ভারতে শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

শিল্পকলা ঃ প্রাচীন ভারতে শিল্পকলার খুবই উন্নতি হয়েছিল। অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে ফা-হিয়েন বলেছিলেন, এ মানুষের তৈরী নয়, দানবের সৃষ্টি। অশোকস্তম্ভ ও স্তম্ভ-শীর্ষের মূর্তিগুলি এবং সাঁচীর বৌদ্ধ স্তূপ দেখলেই বোঝা যায়, মৌর্য যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কত উন্নত ছিল। কুষাণ যুগে মূর্তি-নির্মাণশিল্পের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছিল। ঐ যুগের গ্রীক-প্রভাবিত মূর্তিনির্মাণশিল্পকে **গান্ধার শিল্প** বলা হয়। গুপ্ত যুগে মূর্তি-নির্মাণশিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। প্রাচীনকালে পাহাড় কেটে গুহা-মন্দির নির্মাণের পদ্ধতি চালু ছিল। অজন্তার গুহামন্দিরগুলি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চিত্রকলাতেও প্রাচীন ভারত বিস্ময়কর উন্নতি করেছিল। অজন্তার গুহামন্দিরের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রগুলি আজও সকলকে বিস্মিত করে।

সারনাথে অশোক-স্তম্ভের শীর্ষ

সাহিত্য ঃ সাহিত্যেও প্রাচীন ভারত খুবই উন্নত ছিল। কুষাণ যুগে কবি ও নাট্যকার **অশ্বঘোষ** 'বুদ্ধচরিত'

রচনা করেছিলেন। গুপ্ত যুগে সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটেছিল। এই যুগেই
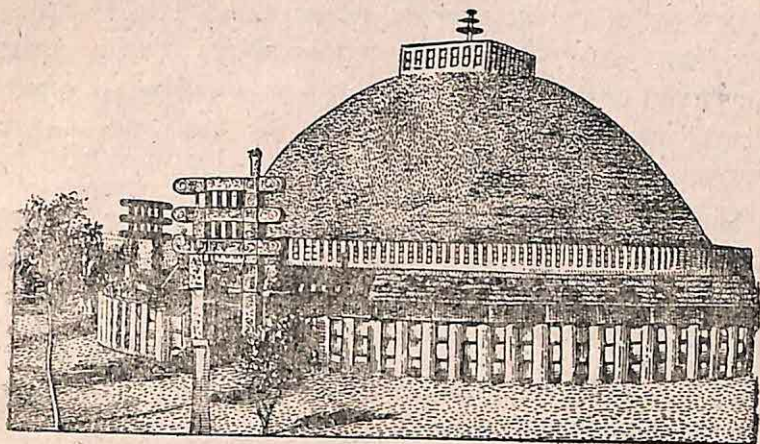
অশোক-স্থাপিত সাঁচী স্তূপ

মহাকবি **কালিদাস** জন্মেছিলেন এবং তাঁর সুবিখ্যাত নাটক ও কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন। **বিশাখা দত্ত, শূদ্রক** প্রভৃতি বিখ্যাত নাট্যকাররাও এই যুগে জন্মেছিলেন। ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা বহু আগে আরম্ভ হ'লেও এই যুগেই সেগুলি বর্তমান রূপ পেয়েছিল।

অজন্তার একটি বিখ্যাত চিত্র

জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করত। এই চর্চা থেকে ভারতীয় ষড়্-দর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল। ধ্বনি, ছন্দ, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয়রা অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ব্যাকরণে **পাণিনির** নাম অমর হয়ে আছে। গুপ্তযুগে প্রাচীন

ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম উন্নতি লাভ করেছিল। এই যুগে **আর্যভট্ট** ও **বরাহমিহিরের** মত জ্যোতির্বিদ্ এবং **ব্রহ্মগুপ্তের** মত গাণিতজ্ঞ জন্মেছিলেন। আর্যভট্টই পৃথিবীতে প্রথম বলেছিলেন, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। রসায়নে ভারত প্রাচীনকালে যে কত উন্নত ছিল, তার প্রমাণ তার ধাতুশিল্প। গুপ্তযুগে নির্মিত যে লৌহ স্তম্ভটি দিল্লীতে আছে, তাতে এই দেড় হাজার বছরেও এতটুকুও মরিচা পড়েনি।

প্রাচীন ভারত চিকিৎসাবিদ্যায় ও ভেষজে অসাধারণ উন্নতি করেছিল। ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন **জীবক, চরক, সুশ্রুত**। জীবক বুদ্ধদেবের ও চারক কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। জীবক সেই যুগেও অস্ত্রচিকিৎসা করতেন। **চরক-সংহিতা** আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

ভারতবাসী যে প্রাচীনকালেও লেখাপড়া জানত, তার প্রমাণ অশোকের লিপিগুলি। জনসাধারণ লেখাপড়া না জানলে কার জন্যে এই লিপিগুলি লেখা হয়েছিল? উচ্চ-শিক্ষারও অভাব ছিল না। পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল **তক্ষশিলায়**। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক জীবক এই তক্ষশিলারই ছাত্র ছিলেন। গুপ্তযুগে **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করত।

অনুশীলনী

১। আর্যরা কোথা থেকে কোন্ পথে ভারতে প্রবেশ করেছিল? তাদের উত্তর-পশ্চিম ভারতে কাদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল? এদের সঙ্গে সংঘর্ষে তাদের জয়ী হওয়ার প্রধান কারণ কি?

২। 'বেদ' শব্দের অর্থ কি? বেদ কটি ও কি কি? প্রত্যেক বেদ ক'ভাগে বিভক্ত? বেদের প্রাচীনতম অংশ কোন্‌টি? সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ বলতে কি বোঝ?

৩। গোড়ার যুগের ভারতীয় আর্যদের সমাজ কিরূপ ছিল?

৪। গোড়ার যুগের ভারতীয় আর্যদের ধর্ম কিরূপ ছিল?

৫। ভারতীয় প্রাচীন মহাকাব্য দুটির নাম কর। এই দুই মহাকাব্য থেকে প্রাচীন আর্যদের সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি?

৬। বর্ণভেদ কি? প্রাচীন আর্য সমাজে বৈদিক যুগে ও মহাকাব্যের যুগে বর্ণভেদ কেমন ছিল?

৭। আশ্রম বলতে কি বোঝ? আশ্রম কটি? কোন্ অবস্থাকে কোন্ আশ্রম বলা হত?

৮। জৈনধর্ম কে প্রবর্তন করেছিলেন? তাঁর সম্পর্কে কি জান? জৈনধর্মের মূলকথা কি? জৈনধর্ম কতখানি বিস্তারলাভ করেছিল?

৯। বৌদ্ধধর্ম কে প্রবর্তন করেছিলেন? তাঁর সম্পর্কে কি জান? বৌদ্ধধর্মের মূলকথা কি? বৌদ্ধধর্ম কিভাবে বিস্তারলাভ করেছিল?

১০। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ঐ সাম্রাজ্যের নাম কেন মৌর্য হয়েছিল? মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১১। অশোক কে? তিনি কিভাবে সিংহাসন লাভ করেছিলেন? তিনি কেন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ক'রে তিনি কি করেছিলেন?

১২। অশোককে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন?

১৩। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন কেন হয়েছিল? ঐ সময়ে কোন্ কোন্ বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করেছিল?

১৪। কণিষ্ক কে ছিলেন? তিনি কোন্ সময়ে রাজত্ব করেছিলেন মনে হয়? তাঁর জীবন ও কৃতিত্ব সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৫। গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল? তিনি কিভাবে রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেছিলেন?

১৬। সমুদ্রগুপ্ত কে ছিলেন? তাঁর দিগ্বিজয় সম্পর্কে কি জান?

১৭। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কে ছিলেন? তিনি 'শকারি' উপাধি নিয়েছিলেন কেন? তিনি কোথায় দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন? তাঁর সম্পর্কে কি জান?

১৮। গঙ্গরিডই জাতি সম্পর্কে কি জান?

১৯। প্রাচীন বঙ্গদেশ সম্পর্কে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে কি জানা যায়?

২০। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ কিরূপ ছিল? রোম সাম্রাজ্য, মধ্য-এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার-যোগাযোগ, সভ্যতা-বিস্তার ও বাণিজ্যের বিবরণ দাও।

২১। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে কি জানা যায়?

২২। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে কি জানা যায়?

২৩। প্রাচীন ভারতের শিল্প-সাহিত্য ও শিক্ষা সম্পর্কে কি জান?

২৪। প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানে কিরূপ উন্নত ছিল?

২৫। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) প্রত্যেক বেদ — ভাগে বিভক্ত, —, —, — ও —।

(খ) মহাবীরের প্রকৃত নাম —, তাঁর পিতার নাম —, মাতার নাম —।

(গ) বুদ্ধদেবের প্রকৃত নাম —। তাঁর বাবা — কপিলাবস্তুতে — বংশের নায়ক ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন — এবং বিমাতা —। তিনি — বা পরম জ্ঞান লাভ করেন।

(ঘ) মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীকদূত ছিলেন —। অশোক বহু — ও — তাঁর বাণী ক্ষোদিত ক'রে দেন।

(ঙ) কণিষ্কের সাম্রাজ্য পশ্চিমে — সাগর থেকে পূর্বে — পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

২৬। ঠিক উত্তরের নিচে দাগ দাও:

(ক) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন হরিষেণ / বাল্মীকি / কালিদাস।

(খ) সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে একথা প্রথম বলেছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত / আর্যভট্ট / বরাহমিহির।

(গ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত / সমুদ্রগুপ্ত / চন্দ্রগুপ্ত।

(ঘ) কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী / পাটলিপুত্র / পুরুষপুর।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

১। কোন্ নদীর তীরে হরপ্পা অবস্থিত?

২। এখন থেকে কত হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

৩। আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম কি?

৪। বুদ্ধদেবের মৃত্যুকে কি বলা হয়? Should be omitted as it has not been discussed in the book.

৫। জৈনধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?

৬। বুদ্ধদেবের কালে মগধের রাজা কে ছিলেন?

৭। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত কাকে পরাজিত ক'রে মগধের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন ?
৮। কিভাবে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয় ?
৯। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ?
১০। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের কি কি উপাধি ছিল ?
১১। কোন্ সম্রাটের আমলে হূণরা প্রথম ভারত আক্রমণ করেছিল ?
১২। প্রাচীন গঙ্গারিডই জাতি কোথাকার অধিবাসী ছিল ?
১৩। কালিদাস কার সভাকবি ছিলেন ?
১৪। আর্যভট্ট কোন্ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?
১৫। কোন্ প্রাচীন শহরের নামের অর্থ 'মৃতের স্তূপ ?
১৬। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, একথা পৃথিবীতে প্রথম কে বলেছিলেন ?
১৭। তুন্ হোয়াং কোথায় অবস্থিত ? সেখানে কি পাওয়া গেছে ?
১৮। ফা-হিয়েন কার সময়ে ভারতে এসেছিলেন ?
১৯। কার এক নাম কৌটিল্য ?
২০। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন ?

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

আনুমানিক	৪০০০—২৯০০	সুমেরীয় সভ্যতার যুগ।
,,	৪২৪১	মিশরীয় অব্দগণনা শুরু।
,,	৩৪০০	মিশরে মেনেসের সিংহাসন লাভ।
,,	৩০০০	সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ।
,,	২৮০০	প্রথম সারগন।
,,	২১০০	বেবিলনের অভ্যুত্থান—হাম্মুরাবি।
,,	২০০০	আর্যদের পারস্যে বসতি স্থাপন।
,,	১৯০০	গ্রীকদের গ্রীকদেশে উপনিবেশ স্থাপন।
,,	১৮০০	হিক্সসদের মিশর অধিকার।
,,	১৪০০	মিশরের ফারাও তৃতীয় থুতমিস।
,,	১২০০	ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস—ইহুদীদের মিশর থেকে মুক্তিলাভ।
,,	১১০০	ট্রয়ের যুদ্ধ।
,,	৭৫৩	রোমের প্রতিষ্ঠা।
,,	৮০০	হোমারের মহাকাব্য রচনা।
,,	৫৫১—৪৭৯	কনফুসিয়াস।
,,	৫৫০—৫২৯	পারস্য সম্রাট সাইরাস।
,,	৫২১—৪৮৫	পারস্য সম্রাট দরায়ুস।
	৪৯০	ম্যারাথনের যুদ্ধ।
	৪৮০	থার্মপাইলির যুদ্ধ।
	৪৬১—৪৩১	গ্রীসে পেরিক্লিসের যুদ্ধ।
	৪৩১—৪০৪	পেলেপনেসীয় যুদ্ধ।
	৩৩৬—৩২৩	আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল।
	৩২৩	মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা।
	২৬৪—২৬১	প্রথম পিউনিক যুদ্ধ।
,,	২২০	চীনা সম্রাট শি হুয়াংতির সিংহাসন লাভ।
	২১৮—২০১	দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ।
	১৪৯—১৪৬	তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ।
	৪৪	জুলিয়াস সীজারের মৃত্যু।
	৩১	অগাস্টাস সীজারের সিংহাসন লাভ।

খ্রীষ্টাব্দ		
”	১	যিশু খ্রীষ্টের জন্ম।
”	৩০৬—৩৩৭	রোম সম্রাট কন্‌স্টানটাইন।
”	৩৩০	কন্‌স্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা।
”	৪৭৬	রোমের পতন।